মাযহাব ও তাকলিদ সিরিজ -১

আপনি কেন মাযহাব মানবেন

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

আপনি কেন মাযহাব মানবেন

মূল : মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী
অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া

প্রকাশক : হাবিবুল্লাহ মিসবাহ
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬
চতুর্থ প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

ISBN : 778-984-91123-50-4

মাকতাবাতুল হেরা

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং-৩ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২২

মূল্য ১৬০ (একশ ষাট) টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى، وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বর্তমানে গায়রে মুকাল্লিদ সালাফীদের ফিতনা আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইংল্যান্ড-আমেরিকা যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই এই ফিতনার মুখোমুখি হচ্ছি। লোকজন তাদের দৌরাত্ম্যের কারণে হয়রান-পেরেশান। এই ফিতনা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে উত্তর হিন্দুস্তানেও।

এর পরিপ্রেক্ষিতে জুন মাসের শেষের দিকে হিন্দুপুর ও মাদ্রাজ শহরে এ ব্যাপারে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ আমার কাছে আসে। আমি উভয় মাহফিলেই অংশগ্রহণ করি এবং তাকলিদ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিই।

ওই মজলিসে আমি যে বক্তব্য পেশ করেছিলাম, সেগুলো আমার এক বন্ধু অডিও ক্যাসেট থেকে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করে তার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে পাঠায়। তাতে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে মুম্বাই থেকে মুফতি মুহাম্মদ উমর আমার একটি দীর্ঘ বক্তৃতা নিয়ে উপস্থিত হন। বক্তব্যটি আমি লন্ডনে পেশ করেছিলাম। অতঃপর আমি এর সবগুলোই দ্বিতীয়বার দেখে দিই। আর বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী কুদ্দিসা সিররুহুর পরামর্শ এবং আমার 'রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া শরহে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' থেকেও কয়েকটি বিষয় সংযোজন করি। ফলে সবগুলোকেই একটি পুস্তিকায় রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

পুস্তকটির নাম নির্বাচন করেছি 'দীন কি বুনিয়াদেঁ আওর তাকলিদ কি জরুরত'। তা এখন আপনার হাতে। আমার আশা ও বিশ্বাস, পাঠক মাসআলা-মাসায়েল বুঝার ক্ষেত্রে এই পুস্তিকা থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাবেন।

এ ছাড়াও মাদ্রাজের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমি তার আসল পরিচয় জানি না। তিনি হাদিস অস্বীকারকারী নাকি তাকলিদ অস্বীকারকারী? এই লোকটাও জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। মাদ্রাজে ক্যাম্পিং করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই ফিতনার মাথা চূর্ণ করা। আশা করা যায় এ ব্যাপারেও পুস্তিকাটি কাজে আসবে।

এই পুস্তিকার মধ্যে দুটি মাসআলা তথা 'দীনের ভিত্তি ও তাকলিদের প্রয়োজনীয়তা'কে ইলমী আন্দাযে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কারণে এই পুস্তিকা থেকে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই পুস্তিকাকে কবুল করুন এবং হিদায়েতের সোপান বানিয়ে দিন। আমীন।

সায়্যিদ আহমদ পালনপুরী
খাদেম, দারুল উলুম দেওবন্দ
১৫ রজব ১৪২৫

সূ চি প ত্র

দীনের ভিত্তি

কুরআনুল কারিমের পরিচয় ১৪
হাদিস শরিফের পরিচয় ১৫
প্রথম আয়াত ১৫
দ্বিতীয় আয়াত ১৫
মুনকিরীনে হাদিস বা হাদিস অস্বীকারকারী ১৯
গায়রে মুকাল্লিদ ১৯
গায়রে মুকাল্লিদদের আকিদা ২০
শিয়া সম্প্রদায় ২১
মওদুদী সম্প্রদায় ২৩
হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি ২৪
তাকলিদের গুরুত্ব ২৫
সালাফিয়্যাত একটি ধোঁকা ২৬
দলিল-প্রমাণ বুঝার ক্ষেত্রে মতবিরোধ ২৭
ইকামতের পদ্ধতিতে ইখতিলাফ ২৭
মূল কথা কী? ৩০
তাকলিদের আবশ্যকতা ৩০
শেষ কথা ৩০
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ৩১

হুজ্জিয়্যতে হাদিস ও ইজমা-কিয়াস

আহলে কুরআন ফিরকা ৩৮
শিয়াসম্প্রদায় সবচেয়ে বড় মুনকিরীনে হাদিস ৪০
আহলে হাদিস ও তাদের ইজমা ৪১
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ৪৪

হাদিস ও সুন্নতের পার্থক্য ৪৪
হযরত আলী রা. এর জারিকৃত সুন্নত ৪৫
প্রথম ক্ষতি ৪৭
দ্বিতীয় ক্ষতি ৪৮
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ৪৮
হযরত আবুবকর রা. এর সুন্নত ৪৯
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর উৎপত্তি ৫২
শরীয়তের তিনটি মূলনীতি ৫৩
শরীয়তের মূলনীতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ৫৪
সকল হাদিস কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ৫৫
ইজমাও কুরআন-হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ৫৬
কিয়াসের সম্পর্ক তিন মূলনীতির সাথেই ৫৭

গোমরাহীর বড় কারণ গোমরাহ লোকদের অনুসরণ

তাকলিদের অর্থের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ৬৪
তাকলিদের সঠিক ব্যাখ্যা ৬৪
তাকলিদ এবং ইত্তেবা একই জিনিস ৬৬
তাকলিদ করা ওয়াজিব ৬৯
ইহসানের অর্থ ৭১
এক হানাফীর শাফেয়ী সেজে নামায আদায় করা ৭২
প্রমাণপঞ্জির উপর প্রশ্ন ও তার উত্তর ৭৩
তাকলিদ মানুষের সবসময় প্রয়োজন ৭৮
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাকলিদ করতে হবে? ৭৯
তাকলিদ ওয়াজিব হওয়ার দলিল চাওয়া উচিত নয় ৮১

চার মাযহাব গ্রহণ করার তাকিদ এবং বর্জন করা ও তার থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

প্রথম দলিল ৮৩
দ্বিতীয় দলিল ৮৪

তৃতীয় দলিল ৮৫
চার মাযহাবের তাকলিদ জায়েয হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা ৮৬
তাকলিদ কার জন্য জায়েয ৮৭
প্রথম দলিল ৮৭
দ্বিতীয় দলিল ৮৮
তৃতীয় দলিল ৮৯
চতুর্থ দলিল ৮৯
প্রথম ব্যক্তি.. ৮৯
দ্বিতীয় ব্যক্তি ৮৯
তৃতীয় ব্যক্তি..৯১
চতুর্থ ব্যক্তি.. ৯২
ইমামগণের সুপ্রসিদ্ধ তাকলিদ ইবনে হাযমের কথার লক্ষ্য নয়.......... ৯২

গায়রে মুকাল্লিদদের শরয়ী বিধান

প্রথম দলিল ৯৫
দ্বিতীয় দলিল ৯৬
তৃতীয় দলিল ৯৮
চতুর্থ দলিল ৯৯
পঞ্চম দলিল..১০১
দ্বিতীয় প্রশ্ন..১০১
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ১০১
ষষ্ঠ দলিল ১০২
সপ্তম দলিল ১০৩
অষ্টম দলিল ১০৪

সাহাবায়েকেরামের মর্যাদা

প্রমাণপঞ্জি ১০৮
প্রথম দলিল ১০৮
দ্বিতীয় দলিল ১১১

তৃতীয় দলিল ১১৫
ফায়েদা ১১৬
হাদিস ১১৬
হাদিসটির সনদ ১১৬
আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদিস ১১৭
হযরত জাবের রা. এর হাদিস ১১৮
উমর রা. এর হাদিস ১১৯
আবু হোরায়রা রা. এর হাদিস ১২০
হযরত আনাস রা. এর হাদিস ১২০
ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস ১২১
মুরসাল হাদিস ১২১
ফায়েদা ১২৩

ইসলামি বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

দীনের ভিত্তি

(লন্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَ نُؤْمِنُ بِه وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه، أَرْسَلَه إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَ دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِه وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِه وَ صَحْبِه وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، وَ بَعْدُ

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

উল্লেখিত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা পরে আসছি। প্রথমে আয়াতের তরজমা পেশ করছি, যাতে পরবর্তী আলোচনা বোঝতে সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

আর যে তার জন্য হিদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করবে।

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

এবং মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্যদের পথ অনুসরণ করবে।

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى

তা হলে সে যা কিছু করবে, আমি তাকে তা করার সুযোগ দেব। সে যে বিষয়ের যিম্মাদার হয়েছে তাকে তার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেবো। সে যে কাজ করবে তাকে তা করতে দেবো, তার হাত ধরে তাকে বাধা দিবো না। তাকে বলবো না, অমন ভুল করো না, যদি ভুল সে করে, তা হলে করতে দেব।

وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। দুনিয়াতে সে যা কিছু করতে চায় করতে দেব। তাকে বাধা দিবো না। কিন্তু আখিরাতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা!

এবার আয়াতের ব্যাখ্যা শুনুন। এর আগে দুটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। এক. হিদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করার অর্থ কী? হিদায়েত স্পষ্ট হওয়া এক বিষয় আর রাসূলের বিরোধিতা করা আরেক বিষয়। সুতরাং রাসূলের বিরোধিতা করার অর্থ কী? এই ব্যাপারে আমাদের ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, কোন্ জিনিস স্পষ্ট হয়েছে? দুই. মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলার অর্থ কী? মুমিনদের পথে চলার প্রয়োজন কেন?

আপনারা সকলেই জানেন, দীনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর। কুরআনুল কারিম হল দীনের প্রথম বুনিয়াদ। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের দ্বিতীয় বুনিয়াদ। সমগ্র উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য হল দীনের তৃতীয় বুনিয়াদ। ইজমায়ে উম্মতও শরীয়তের দলিল, যা দীনের অন্যতম ভিত্তি।

কুরআনুল কারিমের পরিচয়

কুরআনুল কারিম দীনের বুনিয়াদ হওয়ার অনেক দলিল-প্রমাণ রয়েছে। দীনী বিষয়ে সাধারণ লেখাপড়া জানা যেকাউকে প্রশ্ন করলেও এর জবাব পাওয়া যাবে। কুরআনুল কারিমে এ বিষয়ে বহু আয়াত আছে।

হাদিস শরিফের পরিচয়

হাদিস হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বা বাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসও দলিল। এর উপর দীনের ভিত্তি।

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ যে শরীয়তের হুজ্জত বা দলিল, কুরআন থেকে এর প্রমাণ কী? হাদিস থেকে নয় বরং কুরআন থেকে এ কথার প্রমাণ পেশ করুন।

কুরআনুল কারিমে এর অনেক দলিল আছে। একটি না, বরং অনেক আয়াত আছে। যদি কেউ একত্র করতে চান তবে পেয়ে যাবেন।

প্রথম আয়াত

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

> আল্লাহর রাসূল তোমাদের যে আহকাম (শরীয়তের আদেশ-নিষেধ) দিয়েছেন সেগুলো গ্রহণ কর এবং শক্ত করে ধর। আর যেসকল বিষয় থেকে আল্লাহর রাসূল তোমাদের বারণ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক এবং ফিরে আস।

এটি কুরআনুল কারিমের সুরা হাশরের আয়াত। ...قَدْ سَمِعَ اللهُ পারার দ্বিতীয় সুরার আয়াত। যাতে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহর রাসূল যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর ও শক্তভাবে ধর এবং এর উপর আমল কর। আর যেসকল বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেগুলো পরিত্যাগ কর।

দ্বিতীয় আয়াত

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ, وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

> আর যারা রাসূলের আনুগত্য করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে (আপনার আনুগত্য থেকে) বিমুখ হল, (হে

> মুহাম্মদ) আমি আপনাকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।[১] অর্থাৎ যা রাসূলের নির্দেশ ও আহকাম, তাই আল্লাহর নির্দেশ ও আহকাম।

রাসূলের আহকাম যেহেতু হুবহু আল্লাহর তায়ালারই আহকাম সুতরাং তার আনুগত্য করা জরুরি। অতএব যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাদের জন্য আপনাকে আমি প্রহরী বানিয়ে প্রেরণ করিনি। এই আয়াতে রাসূলের বিরোধিতাকারীদের জন্য ধমক এসেছে, তারা যা করতে চায় তার সুযোগ দাও। সময়মতো তাকে দেখে নেওয়া হবে।

কুরআনুল কারিমে অনুরূপ বহুসংখ্যক আয়াত আছে, যার দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের হাদিস হুজ্জত বা দলিল। এর মধ্যে কোনো অভিযোগ ও দ্বিধা-সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু যখন উম্মতের ‘ইজমা’ হুজ্জত বা দলিল এই মাসআলা সামনে আসে অর্থাৎ পুরো উম্মত যখন কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যায় তখন শরীয়তে এর গ্রহণযোগ্যতা আছে। এর দলিল হল, ইমাম শাফেয়ী রহ. কে একবার প্রশ্ন করা হল, আপনারা ‘ইজমায়ে উম্মত’কে শরীয়তের দলিল মানেন, এটা টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত? জবাবে ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন, কুরআনুল কারিমের এই আয়াতটিই তার দলিল,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

এই আয়াতে তিনটি জিনিসের হুজ্জিয়্যতের বর্ণনা আছে। ১. কুরআনুল কারিম হুজ্জত বা দলিল; ২. হাদিস শরিফ হুজ্জত বা দলিল এবং ৩. ইজমায়ে উম্মত হুজ্জত বা দলিল। এ তিনটি বিষয় উক্ত আয়াতে একত্রে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উপর অনেক বেশি রহম করুন। যদি তিনি আমাদের এই সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝাতেন তা হলে আমাদের কোনো উপায় ছিল না। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন, উল্লিখিত তিনটি জিনিস দলিল হওয়ার প্রমাণ একত্রে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এই যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘যেব্যক্তি

---

১. সুরা নিসা, আয়াত ৮০।

হিদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিত করবে।' এই হিদায়েত হল আলকুরআনুল কারিম। কুরআনুল কারিম উম্মতের কাছে এসেছে এবং পরিপূর্ণরূপে কুরআন পৌঁছেছে। পূর্ণ কুরআন আসার পর যেব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে ...।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কুরআনুল কারিমের সাথে সাথে রাসূলের অনুসরণও জরুরি। তার কথাবার্তা, বাণী ও আচার-আচরণও কুরআনের সাথে সমন্বয় করা জরুরি। কুরআনের সাথে সাথে তার অনুসরণও জরুরি। যদি রাসূলের হাদিসসমূহের অনুসরণ করা না হয় এবং তার বিরোধিতা করা হয়, তা হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। শুধু কুরআনের উপর আমল করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

একব্যক্তি বলল, আল্লাহ আমাদের কাছে কুরআন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের কাছে হিদায়েত পাঠিয়েছেন। কুরআন হল هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ সুতরাং আমি এই হিদায়েতের উপরই আমল করব। আমি আর কিছু জানি না। আমি হাদিস মানি না। এমন লোক জান্নাতে যেতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এমন লোক দুনিয়াতে যে পথ অবলম্বন করবে, আমি তাকে তা করতে দেব। কিন্তু আখিরাতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা।

সেই লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন কেন? সে তো কুরআনের উপরই আমল করেছে! এরপরও তাকে জাহান্নামে দিবেন কেন? কেননা সে যদিও কুরআনের উপর আমল করেছে কিন্তু রাসূলের বিরোধিতা করেছে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআনের উপর আমলের সাথে সাথে রাসূলের অনুসরণ করাও জরুরি ছিল, সে তা করেনি।

রাসূলের অনুসরণ এজন্যই জরুরি যে, হাদিস ছাড়া কেউ কুরআনুল কারিমের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতে পারবে না। কুরআনুল কারিমে নামায, রোযা, হজ ও যাকাত ইত্যাদির আদেশ আছে, কিন্তু সেখানে এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ নেই। আর না আছে নামাযের আকার-আকৃতি ও ধারাবাহিকতার বর্ণনা। সুতরাং শুধু কুরআন পড়ে কীভাবে নামায পড়বে? কীভাবে যাকাত দিবে? কীভাবে রোযা রাখবে ও কীভাবে

হজ পালন করবে? আর এর সবকিছু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যেব্যক্তি হাদিস ছেড়ে দিয়ে শুধু কুরআনের উপর আমল করার দাবি করবে সে মিথ্যবাদী। এ কারণেই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

যাহোক দুটি জিনিস শরীয়তের দলিল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হল। কুরআনুল কারিম হুজ্জত বা দলিল এ কথা বুঝতে পারলাম। এর সাথে সাথে হাদিস শরিফও যে শরীয়তের দলিল তাও বুঝা গেল । দীনের ভিত্তি এই দুটো জিনিসের উপর।

কথা এখনও পরিপূর্ণ হয়নি; আরেকটু রয়ে গেছে। অর্থাৎ যারা মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথে চলবে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। তাদের ঠিকানাও হবে জাহান্নাম। আর সেই ঠিকানা অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। জান্নাতে শুধু ওই সকল লোকই যাবে, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কিতাব হিদায়েতের উপর চলবে, রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করবে এবং মুমিনদের পথে চলবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মুমিনদের এ পথই হল 'ইজমায়ে উম্মত' (যা শরীয়তের দলিল)। আমরা অবগত হলাম যে, তিনটি বিষয় শরীয়তের দলিল বা হুজ্জত। যেব্যক্তি এই তিনটি বিষয় মানবে এবং এর থেকে অর্জিত দীন অনুযায়ী চলবে তার জন্যই রয়েছে মুক্তি। আর যেব্যক্তি এই বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু ছেড়ে দিবে তার জন্য মুক্তির কোনো ব্যবস্থা নেই।

কথাটি এভাবেও বলা যায়, কুরআনুল কারিম শরীয়তের দলিল হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারী উম্মতের কারো মধ্যে এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রত্যেকেই কুরআনুল কারিমকে হুজ্জত ও দলিল হিসাবে মানেন। শিয়া সম্প্রদায় কুরআনুল কারিমকে হুজ্জত মানে। মুতাযিলাসম্প্রদায়ও হুজ্জত মানে। খারেজী, গায়রে মুকাল্লিদ, হানাফী, শাফেয়ী এবং মালেকীরাও হুজ্জত মানে। আহলে সুন্নত হোক বা না হোক সবাই কুরআনুল কারিমকে হুজ্জত মানে। এ নিয়ে কারো মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

মুনকিরীনে হাদিস বা হাদিস অস্বীকারকারী

অতঃপর প্রশ্নের উদয় হয়, শুধু কুরআনুল কারিম হুজ্জত না কুরআনুল কারিমের সাথে সাথে আরও কোনো হুজ্জত আছে? এখান থেকেই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলে, কুরআন ব্যতীত কোনোকিছু হুজ্জত হতে পারে না। তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মিথ্যা নয়। এগুলো শুধুই তার কথাবার্তা। যেমন পীর সাহেবদের কথাবার্তা হয়। সেগুলো পড়া হয়, তার থেকে উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু পীর সাহেবদের কথাবার্তা দীনের কোনো ভিত্তি নয়। বুযুর্গদের কথার উপর দীনের ভিত্তি হয় না। বুযুর্গদের কথাবার্তা থেকে দীনী কোনো মাসআলা বের হয় না। এমনিভাবে হাদিস থেকেও কোনো মাসআলা বের করা হবে না। আমরা হাদিস পড়ব এবং হাদিসে যেসকল উপদেশ আছে সেগুলো থেকে উপকৃত হব কিন্তু এর দ্বারা দীন সাব্যস্ত করব না। দীন শুধু কুরআন থেকেই বের করব।

মুসলমানদের মধ্যে একটি দল সৃষ্টি হয়েছে। এই দলের নাম 'মুনকিরীনে হাদিস'। অর্থাৎ হাদিসকে শরীয়তের দলিল মান্যকারী নয় এমন লোকদের দল। তাদের এই নামটি দিয়েছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। কিন্তু উক্ত দলের লোকজন নিজেদের আহলুল কুরআন বলে পরিচয় দেয়। অর্থাৎ কুরআন মান্যকারী। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের লোকজন পাকিস্তানে আছে এবং এই দলের লোকজন ইংল্যান্ডেও আছে। কেননা এমন কোনো ভ্রান্ত দল নেই, যার অস্তিত্ব ইংল্যান্ডে নেই। আল্লাহর রহমত! সেখানে ভালো মানুষও আছে। আবার খারাপ লোকও আছে। এই দেশটি ভালো-মন্দের মিলন ক্ষেত্র। এজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেখানেও আহলে কুরআন আছে।

গায়রে মুকাল্লিদ

আরেকটি সম্প্রদায় আছে। তারা বলে, 'কুরআনের পর শরীয়তের দলিল হল হাদিস। কুরআন-হাদিস ব্যতীত কোনোকিছু শরীয়তের দলিল হতে পারে না।' মুসলমানদের ইজমা হুজ্জত নয়। মুসলমানদের আদর্শ সাহাবায়েকেরামের ইজমাও হুজ্জত বা শরীয়তের দলিল নয়। শুধু কুরআন এবং হাদিসই শরীয়তের দলিল। কুরআন-হাদিস ব্যতীত অন্যকোনো

জিনিস শরীয়তের দলিল নয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি দল-উপদল রয়েছে। তন্মধ্যে 'আহলে হাদিসসম্প্রদায়'ও এমন কথা বলে। আহলে হাদিসও আহলে কুরআনের মতোই। আমরা তাদের গায়রে মুকাল্লিদ বলি। কিন্তু আরববিশ্ব তাদের 'লা-মাযহাবী' বলে থাকে। অর্থাৎ তারা ওইসব লোক, যাদের কোনো মাযহাব নেই। তাদের বিরুদ্ধে আরবিভাষায় যেসব কিতাব রচিত হয়েছে, সেগুলো 'লা-মাযহাবিয়্যা' নামে পরিচিত। আর তারা এখন নিজেদের আহলে হাদিস বলে পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথে নিজেদের সালাফীও বলতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ তাদের সালাফী বলছে; কেউবা বলছে আহলে হাদিস।

গায়রে মুকাল্লিদদের আকিদা

এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য হল, কুরআন হুজ্জত, হাদিস হুজ্জত তবে সকল হাদিস হুজ্জত নয়। শুধু সেইসব হাদিসই হুজ্জত, যেগুলো সহীহ। যয়ীফ বা দুর্বল হাদিস হুজ্জত নয়। তারা হাদিসকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে- এক. সহীহ হাদিস; দুই. যয়ীফ হাদিস। তারা বলে সহীহ হাদিস হুজ্জত আর যয়ীফ হাদিস হুজ্জত নয়।[২]

---

২. এখানে এ কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া জরুরি যে, আরবের একজন প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ হলো শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী। তিনি নিকটবর্তী সময়ে অতীত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন নওমুসলিম। হাদিসশাস্ত্রে তার ভালো পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি মুসলিম উম্মাহর বিরাট ক্ষতি সাধন করে গেছেন। সম্ভবত আর কেউ এমন ক্ষতি করতে পারেনি। এর একটু বিশ্লেষণ হল, হাদিস তিন প্রকারঃ সহীহ, যয়ীফ ও মওযু। হাদিস লিপিবদ্ধ করার প্রথম যুগ থেকে সহীহ হাদিসের সাথে সাথে জয়ীফ হাদিসগুলোও কিতাবে লেখা হচ্ছে। আর মওযু হাদিসগুলোকে লেখা হত আলাদা। কেননা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রথমে দলিল পেশ করা হয়। আর যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে সহীহ হাদিস না পাওয়া যায়, শুধু জয়ীফ হাদিস পাওয়া যায় তখন সকল ফকীহ যয়ীফ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। আর আমলের ক্ষেত্রে তো তা সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদিতে সহীহ হাদিসের সাথে সাথে কিছু জয়ীফ হাদিসও লেখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নাসিরুদ্দীন আলবানীর আগমন হল। তিনি যয়ীফ হাদিসগুলো সহীহ হাদিস থেকে আলাদা করে মওযুর অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। সে একটি কিতাবকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে নাম রেখেছেন سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ। দ্বিতীয় আরেকটি কিতাবও কয়েকটি খণ্ডে লিখে নাম দিয়েছেন سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَ الْمَوْضُوْعَةِ، وَ أَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ। অর্থাৎ জয়ীফ ও মওযু বর্ণনাসমূহ এবং উম্মাহর মাঝে এর কুপ্রভাব। এমনিভাবে তিনি দুর্বল বর্ণনাকে মওযু বা জাল হাদিসের

অতঃপর কোনটি সহীহ হাদিস তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে। অন্যদের অনুসরণ করে না। মোটকথা তারা পুরো হাদিসভাণ্ডারের অনুসরণ করে না। তারা বলে, আমরা হাদিস মানি। কিন্তু হাদিসের পর ইজমায়ে উম্মত মানি না। সাহাবায়েকেরামের ইজমাও মানি না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শিয়া সম্প্রদায়

আরেকটি সম্পদ্রায় হল শিয়া সম্প্রদায়। শিয়া সম্প্রদায়ের বক্তব্য হল 'ইজমা' শরীয়তের দলিল নয়। তাদের কাছে শুধু কুরআন শরীয়তের দলিল। কিন্তু তারা এ কথাও বলে যে, এই কুরআন পরিপূর্ণ নয়। কুরআনের আরো দশ পারা নিয়ে ইমাম অদৃশ্য হয়ে গেছেন। অথচ কোনো শিয়া এই কথার স্বীকারোক্তি দেয় না। কেননা কেউ যদি এই কথা স্বীকার করে তা হলে অবশ্যই তাকে কাফের ধরে নেওয়া হবে। কেউ তাকে মুসলমান বলবে না। অথচ শিয়াদের একটি নয়, পঞ্চাশটি কিতাবে এমনটি পাওয়া যাবে যে, এই কুরআন পরিপূর্ণ নয়।

এমনিভাবে তারা এই কথাও বলে যে, হাদিস শরীয়তের দলিল কিন্তু 'আহলে সুন্নাহ'র কিতাবে বর্ণিত হাদিস শরীয়তের দলিল নয়। এর সবই মিথ্যা কথা। আমাদের কিতাবাদিতে যেসকল হাদিস আছে, সেগুলো সহীহ এবং সেগুলোই শরীয়তের দলিল। এই লোকগুলো গায়রে মুকাল্লিদ থেকেও একধাপ আগে বেড়ে গেছে। গায়রে মুকাল্লিদরা তো আমাদের কিতাবকে দুই ভাগ করে বলে, এগুলো সহীহ আর এগুলো যয়ীফ। সহীহ হাদিস শরীয়তের দলিল এবং যয়ীফ হাদিস দলিল নয়। আর শিয়ারা তো আমাদের হাদিসের কিতাবসমূহের ব্যাপারে এই কথা বলে দিয়েছে, এগুলোর সবকিছু মনগড়া। আমরা এগুলোর একটাও মানি না। আমাদের

সমপর্যায়ের করে দিয়েছেন। আর জনসাধারণের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, জয়ীফ হাদিসের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আরব যুবকরা মুহূর্তেই বলে দেয় هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ। আর এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল, এটি মওযু পর্যায়ের বর্ণনা। আর এমন ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়াই হল এই তথাকথিত মুহাদ্দিস আলবানী সাহেবের কীর্তি। যার কারণে উম্মতের এতো বড় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা থেকে উম্মতকে ফিরিয়ে আনতে শতবর্ষ অতীত হয়ে যাবে।

কিতাবে যেই হাদিস আছে সেগুলোই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদিস।

অতঃপর যখন ইজমায়ে উম্মতের·বিষয়টি এলো। উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সাহাবায়েকেরামের ইজমার বিষয়টি এলো, তারা বলল, আমরা তাদের ইজমাও মানি না। আর সর্বপ্রথম সংঘটিত ইজমা হযরত আবুবকর রা.-এর খিলাফতের উপর। ওই সময় যত মুসলমান ছিলেন, সাহাবী বা সাহাবী না এমন সবাই হযরত আবুবকর রা. এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। শিয়ারা এই ইজমা মানে না। অতঃপর হযরত সিদ্দিকে আকবর রা.-এর যমানা চলে গেল। তখন হযরত ফারুকে আযম রা.-এর কাছে সকল মুসলমান বায়আত গ্রহণ করলেন। একজন মুসলমানও এমন ছিলেন না, যিনি তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেননি। হযরত আলী রা.-ও তার বায়আত গ্রহণ করেন। সবাই বায়আত গ্রহণ করেন। এই দুজনের খিলাফত ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এমনিভাবে হযরত উসমান রা. এর খিলাফতও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে আরো অনেক মাসআলা-মাসায়েল ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। শিয়ারা এই তিনজনের খিলাফতই মানে না। এই তিনজনের খিলাফত যেন তাদের মেনে নিতে না হয় তাই তারা ইজমায়ে উম্মত অস্বীকার করে। যদি তারা ইজমায়ে উম্মতকে শরীয়তের দলিল হিসাবে মেনে নেয় তা হলে সর্বপ্রথম হযরত আবুবকর রা.-এর খিলাফত মেনে নিতে হবে। অতঃপর হযরত উমর ফারুক রা.-এর খিলাফতও মানতে হবে। তারপর হযরত উসমান রা.এর খিলাফতও সামনে আসবে। যাতে তারা তিনজনের খিলাফতই অস্বীকার করতে পারে। তাই প্রথম থেকেই তারা ইজমায়ে উম্মতকে অস্বীকার করে আসছে। এখন 'বাঁশও থাকবে না, আর বাঁশিও বাজবে না' এর মতো অবস্থা হল।

শিয়া সম্প্রদায়ের আরো অনেক উদ্ভট বক্তব্য আছে, যেগুলোর বিবরণ অনেক দীর্ঘ। বুনিয়াদি যে মাসআলায় আমাদের সাথে তাদের মতবিরোধ তা হল এই মাসআলটিই। তারা কুরআন ও হাদিসের পর ইজমায়ে উম্মতকে শরীয়তের দলিল হিসাবে মানে না। আমরা ইজমায়ে উম্মতকে শরীয়তের দলিল হওয়ার দাবি করি।

মওদুদী সম্প্রদায়

আরেকটি সম্প্রদায়, যারা সাহাবীগণকে গুরুত্ব দেয় না। তারা মওদুদী ফিরকা নামে পরিচিত। মওলানা মওদুদী সাহেব প্রথমে আমাদের দলেরই লোক ছিলেন। মুফতি কিফায়েতুল্লাহ রহ. এর কাছেও কিছু বই-পত্র পড়েছিলেন। তিনি তদানীন্তন প্রকাশিত আমাদের সংবাদপত্র 'দৈনিক জমিয়ত'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমাদের দলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, আলাদা কিছু ছিলেন না। কিন্তু তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই একে কেন্দ্র করে মতবিরোধের সূচনা। নতুন একটি দল প্রতিষ্ঠা করা বড় কথা নয়। কত তানযিম কত আনজুমান প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তিনিও একটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভুল কোনো কাজ করেননি। সেসময় কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্বও তার সাথে ছিলেন। হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী রহ., মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. ও হযরত মাওলানা বখতিয়ারী রহ. তার সাথে ছিলেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা একটি রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল। এবং হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টিও সামনে ছিল। তাই সেসব বড় বড় ব্যক্তিও তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছিলেন। অতঃপর তারা দিল্লিতে একটি কন্‌ফারেন্সের ডাক দিলেন। সেখানে জামায়াতে ইসলামীর বুনিয়াদি মূলনীতি পেশ করা হল। সেই বুনিয়াদি মূলনীতির দ্বিতীয় ধারায় একটি বিষয় উল্লেখ ছিল যে, এই জামায়াতে ইসলামীতে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য জরুরি হল, তারা শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের যেহ্‌নী গোলামি করবে। অন্যকারো যেহ্‌নী গোলামি করবে না। তখনই সাহাবায়েকেরামের মর্যাদা এবং ইমামগণের অনুসরণের বিষয়টি সামনে চলে আসে। অর্থাৎ সাহাবীগণ যা কিছু বলেছেন অথবা সকল সাহাবা যে সিদ্ধান্তের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি যে, সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি কী না? তাদের অনুসরণ করা হবে কী না? আমাদের ও তাদের মাঝে বিদ্যমান মতবিরোধের সূচনা মূলত সেদিন থেকেই। তারা বলে, আমরা কীভাবে সাহাবীদের সমালোচনা করি? আমরা যখন বলি, সাহাবীদের সমালোচনা কর বা না কর সেটি আলোচনার বিষয় নয়; বরং পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বল,

আল্লাহ ও তার রাসূলের 'যেহ্নী গোলামি' করা যেমন জরুরি তেমনিভাবে তাদের প্রত্যেক কথা মানতে হবে কী না? এমনিভাবে সাহাবীদের ঐক্যবদ্ধ কথা এবং তাদের ব্যক্তিগত কথা শরীয়তের দলিল কী না? এটা বললে তখন তারা চুপ থাকে, কেউ বিষয়টি স্পষ্ট করে না।

আপনারা জানেন উল্লিখিত কয়েকটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ হয়েছে মূলত 'ইজমায়ে উম্মত' নিয়ে। এ সকল সম্প্রদায় কুরআন ও হাদিসকে শরীয়তের দলিল মানে বটে কিন্তু 'ইজমায়ে উম্মত'কে শরীয়তের দলিলরূপে মানে না।

আর গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা স্পষ্টভাবে বলে, ইজমা শরীয়তের কোনো দলিল না। মুহাম্মদ পালান হক্কানী (মুহাম্মদ তার নাম আর পালান তার পিতার নাম) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف (খুলাফায়ে রাশেদীনের সঙ্গে গায়রে মুকাল্লিদদের মতবিরোধ)। এ কিতাবে তিনি ওই সকল মাসআলা একত্র করেছেন, যেগুলো খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সাহাবীগণের ঐকমত্যে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই মাসআলাগুলো গায়রে মুকাল্লিদগণ মানে না। কেননা তাদের মাযহাবের ভিত্তিই হল এ কথার উপর যে, 'ইজমা হুজ্জত নয়'। হোক না সেই ইজমা সাহাবীদের।

কিন্তু এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাতে যাওয়ার পথ একটিই; তা হল উক্ত তিনটি বিষয় মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়েত এসেছে তার অনুসরণ করা। এর সাথে সাথে রাসূলের উপর যে হিদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি তার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তার অনুসরণ করা। এ উভয় বিষয়ের সাথে সাথে মুমিনগণ যে পথে চলেছেন সে পথ অবলম্বন করা। কিন্তু যে ব্যক্তি মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে, তার ঠিকানা জান্নাত হবে না। সে দুনিয়াতে যে পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সে পথে চলতে দিবেন। বাধা দিবেন না। কিন্তু আখিরাতে তাকে দেখে নিবেন।

হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.। তাকে আহলে হাদিস (গায়রে মুকাল্লিদ) ভাইয়েরাও মানে। বরং

তারা এও বলে যে, শাহ সাহেব রহ. গায়রে মুকাল্লিদ তথা লা-মাযহাবী ছিলেন। অথচ কথাটি একেবারে অসত্য। তার রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র প্রথম অংশ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শাহ সাহেব রহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন উম্মতের মাঝে ফিকহী মতবিরোধ কীভাবে শুরু হয়েছিল। শাহ সাহেব রহ. বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন, উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম গবেষকদের দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। প্রথমটি 'আহলুর রায়'। দ্বিতীয়টি হল 'আসহাবুল হাদিস'। আহলুর রায়-এর ইমামগণ হলেন ইমাম শা'বী, ইমাম ইবরাহিম নাখায়ী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম ইবনে আবু ইয়ালা, ইমাম ইবনে শুবরুমা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার রহ.। এদের প্রত্যেকেই আহলুর রায়-এর বড় বড় ব্যক্তিত্ব। আর 'আসহাবুল হাদিস'-এর আকাবির হলেন মদিনার বিশিষ্ট সাত ফকীহ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম সাওরী এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.।

তাকলিদের গুরুত্ব

আহলুর রায় আলেম ও ফকীহগণের মাঝে প্রথমে কোনো মতবিরোধ হয়নি। তারা সকলেই তাদের বড় ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা রহ. কে মেনে নেন। পক্ষান্তরে যারা আসহাবুল হাদিস ছিলেন তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। ইমাম মালেক রহ. তার সকল শাগরিদকে নিয়ে এক দিকে চলে গেলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর শাগরিদ ইমাম আহমদ রহ. এর ফেকাহও আলাদা হয়ে গেল। মোটকথা যখন অনেক বেশি ইখতিলাফ হল, তখন উম্মত সিদ্ধান্ত নিল যে, বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলিদ তথা অনুসরণ করা জরুরি। অন্যথায় যদি লোকজনকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে ভবিষ্যতে কী হবে তা জানা নাই। নিত্য-নতুন মুজতাহিদের জন্ম হতে থাকবে আর উম্মত বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। এজন্য কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নির্ধারণ করা জরুরি। যেন প্রত্যেকেই তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারে। সুতরাং আসহাবুর রায় থেকে একব্যক্তিকে নির্বাচন করা হল অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. নির্বাচিত হলেন।

সুতরাং তার গবেষণাকে মান্যকারী সকলেই তার তাকলিদের উপর ঐকমত্য হয়ে গেল। আসহাবুল হাদিস বা হিজাযী মুজতাহিদদের মধ্য থেকে তিনজনকে নির্বাচন করা হল- ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ.। এই হিজাযী মুজতাহিদগণকে মান্যকারী সকলেই তাদের তাকলিদের উপর একমত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই উম্মতের বিচ্ছিন্নতা বন্ধ হয়ে গেল এবং ভবিষ্যতে ইখতিলাফ তথা মতবিরোধের ধারাও বন্ধ হয়ে গেল।

অতঃপর শাহ সাহেব রহ. পরিশিষ্টের শেষের দিকে লিখলেন, এই আসহাবুল হাদিস এক দল আর আহলে হাদিস আরেক দল- এমনটি ভেবে যেন কেউ ধোঁকায় না পড়ে। কেননা আসহাবুল হাদিস হলেন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. এর অনুসারীগণ। আর আহলে হাদিস হল অন্য একটা দল, যাদের যাহেরীও বলা হয়। এরাই হল গায়রে মুকাল্লিদ। এদের মাযহাবের ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর। এক. তারা কিয়াস মানে না। দুই. তারা সাহাবীদের কথাকে হুজ্জত মানে না।

শাহ সাহেব রহ. এর আরেকটি কিতাব হল عقد الجيد। তাতে তিনি লিখেছেন, তারা ইজমায়ে উম্মতও মানে না। এজন্যই তারা আসহাবুল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সালাফিয়্যাত একটি ধোঁকা

অতঃপর এই গায়রে মুকাল্লিদরা নিজেদের নাম রাখল সালাফী। যেন পুরাতন শিকারী নতুন জাল বিছিয়েছে। মেটে বর্ণের এমন জাল বিছিয়েছে, অপরিপক্ব ইলমের অধিকারী যুবকরা খুব সহজেই সেই জালে আটকে যায়। কেননা তারা জানে না এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর কারণে সারা পৃথিবীতে সালাফী বা গায়রে মুকাল্লিদদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। আর সাধারণভাবে এর শিকার হচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। যারা অপরিপক্ব ইলমের অধিকারী তারাই মূলত এই ফিতনার শিকারে পরিণত হয়। তারা এটা চিন্তাও করে না যে, কে তাদের কুরআন-হাদিস বুঝাবে? একজন মানুষই তো বুঝাবে, এখন সেই মানুষটি একজন জীবিত ব্যক্তিও হতে পারেন, যার ইলমের ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই। আবার সে

মৃত্যুর পূর্বে পথভ্রষ্ট হবে না এরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথবা তাকে অতীতের কোনো মহান ব্যক্তি (কুরআন-হাদিস) বুঝাবেন, যিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ও ইলমের পাহাড়, যার তাকওয়া তাহারাত ছিল জগদ্‌বিখ্যাত, যার কুরআন-হাদিসের জ্ঞান ছিল দিবালোকের চেয়েও বেশি স্পষ্ট।

দলিল-প্রমাণ বুঝার ক্ষেত্রে মতবিরোধ

কুরআন-হাদিস বুঝা সকলের কাজ নয়। এর মধ্যে কখনও দুটি মত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় যার প্রতি যার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ বেশি হয়, সে তার উপরই ভরসা করবে। এ ছাড়া আল্লাহ ও তার রাসূলকে অনুসরণের অন্যকোনো পন্থা নেই। এর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

ইকামতের পদ্ধতিতে ইখতিলাফ

একটি হাদিসে আছে, "اُمِرَ بِلَالٌ أن يَّشفعَ الْأَذَانَ وَ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ" অর্থাৎ হযরত বেলাল রা. কে আদেশ করা হল, তিনি যেন আযান জোড় জোড় করে বলেন। আর তাকবির যেন বেজোড় বলেন। তাকবির বিজোড় বলার অর্থ কী? ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ রহ. এর মতে (বিজোড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল) একইধরনের শব্দগুলো একবার করে পড়া। যেমন,

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ،
اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

(উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. এর মতে قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুইবার বলতে হবে। আর ইমাম মালেক রহ. এর মতে এটিও একবার বলতে হবে।) এই ইমামগণ হাদিস শরিফের এমন অর্থ ও উদ্দেশ্যই বুঝেছেন। কাজেই তাদের অনুসারীগণ এর উপরই আমল করে থাকেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এবং অন্য ইমামগণ বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য এমনটি নয়। কেননা তিনি শুরু এবং শেষে اَللهُ أَكْبَرُ দুইবার

বলেছেন। সুতরাং একবার বলা কোথায় পাওয়া গেল? আর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ তো দুইবার ঠিকই বলা হয়। আবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ তিনি শুরুতে এবং শেষে দুইবারই বলেছেন। সুতরাং একবার বলার বিষয়টি কীভাবে প্রমাণিত হয়?

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার শাগরিদগণ বলেছেন, বিজোড় ও জোড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল আযানের মধ্যে একইধরনের শব্দগুলো দুই শ্বাসে দুইবার করে আলাদাভাবে বলা। আর তাকবিরের (ইকামতের) ক্ষেত্রে একধরনের শব্দ এক শ্বাসে দুইবার বলা। সুতরাং আযানের ক্ষেত্রে মুয়াযযিন এভাবে বলবেন, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অতঃপর চুপ হয়ে যাবে। অল্পক্ষণ পর আবার বলবে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এই (বাক্য) দুই শ্বাসে আলাদা করে বলবে এবং এটিই হল আযানে জোড় করে বলা।

আর তাকবির বলার পদ্ধতি হল, একই ধরনের বাক্যগুলো একসাথে বলবে। যেমন, اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ এই চারটি বাক্য এক শ্বাসে বলবে। অতঃপর নিঃশ্বাস ছেড়ে দিবে। অতঃপর أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এক শ্বাসে বলবে এবং নিঃশ্বাস ছেড়ে দিবে। অনুরূপ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ এক নিঃশ্বাসে বলে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিবে। এমনিভাবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ। অনুরূপভাবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ। অতঃপর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে দ্বিতীয়বার قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলবে। অতঃপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ এক নিঃশ্বাসে বলবে এবং শেষে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ আলাদা এক নিঃশ্বাসে বলবে।[৩]

---

৩. এখানে এই মাসআলাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথম বাক্যের শেষেও জযম পড়তে হবে। এমনিভাবে اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ এর "ر" বর্ণের উপর পেশ পড়বে না বরং সাকিন পড়বে। এভাবেই পূর্ণ তাকবির বলবে। কিছু মানুষ প্রথম কালিমার শেষে إِعْرَابٌ দিয়ে পড়ে। তারা প্রথম তিন কালিমার أَكْبَرُ এর "ر" বর্ণে পেশসহযোগে পড়ে। এটি ভুল পদ্ধতি। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে, তাকবিরে জযম হবে।

আমাদের এখানে তাকবিরের ভুল পদ্ধতি চালু রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, মসজিদে নববীতে যখন তাকবির শুরু হতো, তখন আমি বাকী-এর নিকটবর্তী পশুর হাটে থাকতাম। সেখান থেকে রওয়ানা হতাম। তারপর তাকবির শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়ে যেতাম। আপনারা হয়তো বাকী দেখেছেন। এক ইঞ্চিও এদিক সেদিক হয়নি। মাঝখানের বাড়িঘরগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাকীর কবর স্থান সেখানেই আছে। স্থানটি কতটুকু দূর তা সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন। এখন তো মসজিদে নববী বাকীর সাথে মিলিত হয়েছে। সেখানে পশুর একটি হাট ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সেই হাটে বেচাকেনা করতেন। মসজিদে তাকবির শুরু হতো, তখন সেখান থেকে দ্রুত হেঁটে তাকবির শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রথম কাতারে এসে শরিক হতেন। কিন্তু আজ আমরা তাকবির বলি আর এক শ্বাসে শেষ করে দিই অথবা দুই শ্বাসে পূর্ণ করে দিই। যদি দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে সেও কাতারে এসে দাঁড়াতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট তাকবির একবার বলার অর্থ ও উদ্দেশ্য এটিই। এর দলিল হল, আবু দাউদ শরিফের রিওয়ায়েত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন মুয়াযযিন ছিলেন। তার নাম আবু মাহজুরা রা.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কার মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন। তিনি তাকে তাকবিরের ১৭টি কালিমা শিখিয়েছিলেন। ১৭ কালিমা তখনই পূর্ণ হবে, যখন আযানে ১৫ কালিমা পরিপূর্ণ বলা হবে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুইবার পড়া হবে। দুটি হাদিসের উপর আমল করার পদ্ধতি হল, সকল কালিমা বলা হবে কিন্তু একধরনের কালিমাগুলো এক শ্বাসে বলতে হবে।

দেখুন! কতবড় মতানৈক্য হয়ে গেল। তিনজন ইমাম বলেছেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হবে এমন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হবে এটা। এখন যেব্যক্তি হানাফী সে তার ইমামের কথার উপর আমল করবে। আর অন্যরা যে যেই ইমামের অনুসরণ করে সে তার উপরই আমল করবে, তার ইমাম যা বুঝিয়েছেন। সুতরাং এটি ইমামদের অনুসরণ নয়। কেননা তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ বুঝিয়েছেন। সুতরাং এটা রাসূলেরই অনুসরণ।

মূল কথা কী?

মূল কথা হল, চার ইমামই কুরআনকে দলিল মানেন। হাদিসকে দলিল মানেন এবং ইজমায়ে উম্মতকেও দলিল মানেন। আহলে হাদিস সম্প্রদায় ইজমায়ে উম্মতকে দলিল হিসাবে মানে না। সুতরাং তারা যেহেতু দলিলই মানে না তখন তারা ইমামের অনুসরণ কীভাবে করবে? এই কারণে তারা গায়রে মুকাল্লিদ আলেমদের অনুসরণ করে। যার ফলে প্রমাণিত হয় তারা আমাদের চেয়েও অনেক বড় মুকাল্লিদ (মাযহাবী)।

তাকলিদের আবশ্যকতা

তাকলিদ এবং অনুসরণ ছাড়া জীবনের গাড়ি একধাপও চলতে পারে না। মিস্ত্রী তার প্রবীণদের অনুসরণ করে। কামার তার প্রবীণদের অনুসরণ করে। বিজ্ঞানী তার অগ্রজ বিজ্ঞানীদের অনুসরণ করে। স্থপতি প্রবীণ স্থপতিদের অনুসরণ করে। বাচ্চা তার বাবার আঙুল ধরে হাঁটে। অনুসরণ করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই। সুতরাং ওই চার ইমামের অনুসরণ করুন, যারা সাহাবীদের ইজমাকে দলিল হিসাবে মানেন। অথবা ওইসব গায়রে মুকাল্লিদের অনুসরণ করুন, যারা সাহাবীদের ইজমাকে দলিল হিসাবে মানে না। সর্বাবস্থায় অনুসরণ বা তাকলিদ জরুরি। অনুসরণ বা তাকলিদ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শেষ কথা

পরিশেষে একটি কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। এই যে দুটি দল 'আহলে কুরআন' ও 'আহলে হাদিস'। উভয়টি একইধারার দল।

আহলে কুরআন অর্থাৎ কুরআন ছাড়া অন্যগুলোকে দলিল হিসাবে না মানা। হাদিস এবং ইজমা অস্বীকার করা। শুধু তারাই কুরআনকে দলিল হিসাবে মানে এটা আহলে কুরআনের অর্থ নয়। কেননা কুরআনকে তো সকল মুসলমানই দলিল হিসাবে মান্য করে।

আহলে হাদিসও এমনই। তারা হাদিসের পর ইজমাকে দলিল হিসাবে মানে না। সুতরাং আহলে হাদিসের অর্থ হল, তারা শুধু হাদিস মানে, ইমামদের মানে না। আর মুকাল্লিদরা হাদিস মানে না শুধু ইমামদের কথার উপর আমল করে। ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। পৃথিবীর সমস্ত লাইব্রেরি

ঘুরে আসুন। আজকের দুনিয়ায় হাদিসের যত কিতাব আছে, এর সবই এই চার ইমামের অনুসারীগণ সংকলন করেছেন। গায়রে মুকাল্লিদরা তাদের বড়দের একটি কিতাব হলেও দেখাক। তাদের বড়রা হাদিসের একটি কিতাবও লেখেনি।[৪]

আজ পুরো দুনিয়াতে হাদিসের যত ভাণ্ডার রয়েছে, এর পুরোটাই মুকাল্লিদদের তৈরী। যদি মুকাল্লিদগণ হাদিসের অনুসরণ না করতেন তবে ওই হাদিস জমা করার ক্ষেত্রে তাদের কী প্রয়োজন ছিল বেলুন দিয়ে পাতলা রুটি তৈরি করার? অধিক কষ্ট আর পরিশ্রম করার? মূলকথা হল আহলে হাদিসরা কুরআন ও হাদিস মানে কিন্তু এরপর উম্মতের এবং সাহাবীগণের যে ইজমা আছে, মুমিনদের যেই রাস্তা আছে তা মানে না। গায়রে মুকাল্লিদরা কখনোই স্বীকার করে না যে, আমরা সাহাবীদের ইজমা মানি না। যদি তারা এ কথা মুখ থেকে বের করে তা হলে মুসলমানগণ তাদের মুখে থুথু দিবে। তাদের সাথে কথাও বলবে না। তাই কোনো গায়রে মুকাল্লিদ কখনোই এই কথা স্বীকার করে না। এই কারণেই আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. লিখেছেন, আহলে হাদিস ইজমা, কিয়াস ও সাহাবীদের আসার (কথা) অস্বীকার করে।

কাদিয়ানিদের অবস্থাও তাই। কোনো কাদিয়ানি বলে না যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে না। প্রত্যেক কাদিয়ানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে, পাশাপাশি এও বলে যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী। তারা খাতামুন নাবিয়্যিনের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। তারা যদি স্বীকার করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী নন তা হলে একজন চরম অজ্ঞ মুসলমানও তাদের মুখে পেশাব করে দিবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত

আমাদের নাম হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। সুন্নত বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলকৃত হাদিস এবং খুলাফায়ে

৪. যদিও আলবানী সাহেব দুটি সংকলন তৈরি করেছেন কিন্তু উম্মতের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন।

রাশিদিনের তরিকাকে। কুরআন মানার ক্ষেত্রে কারো কোনো ঝগড়া নেই, সবাই তা মানে। আমরা কুরআনের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসও মানি। আর জামাত অর্থাৎ মুসলিম জামাতের ঐক্যবদ্ধ যেকোনো ফয়সালা আমরা মানি। আমরা হলাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত ব্যতীত নাজাতের কোনো রাস্তা নেই। এখন আয়াতে কারিমাটি আবার শুনুন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآئَتْ مَصِيْرًا

যেব্যক্তি হিদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ কুরআনে কারিম সামনে এসে যাওয়ার পর রাসূলের অনুসরণ করে না; বরং) রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে। তা হলে সে যা কিছু করতে চায় (যে রাস্তা গ্রহণ করতে চায়) আমি তাকে তা করতে দেবো। হাত ধরে তাকে বাধা দিবো না। কিন্তু আখিরাতে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হুজ্জিয়্যাতে হাদিস ও ইজমা-কিয়াস

(মাদ্রাজের একটি দীনী ইজতেমায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَ نُؤْمِنُ بِه وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِيَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللّٰهُ وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا وَ حَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه، أَرْسَلَه إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَ دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِه وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِه وَ صَحْبِه وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، وَ بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَ سَآئَتْ مَصِيْرًا وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

আজকের মজলিসে আলোচনার জন্য আমাকে একটি শিরোনাম ধার্য করে দেওয়া হয়েছে– 'হুজ্জিয়্যাতে ইজমা ও কিয়াস'। ইজমা শরীয়তের দলিল। এর জন্য আবার কিসের দলিল? কিয়াস শরীয়তের দলিল, তার জন্য আবার কিসের দলিল? আমি এই শিরোনামের সাথে সামান্য বৃদ্ধি করেছি। এখন শিরোনাম হল– 'হুজ্জিয়্যাতে হাদিস, ইজমা ও কিয়াস'। শিরোনামের মাঝে এটি বৃদ্ধি করার কারণ হল, পথভ্রষ্ট দলগুলো এই দুই জিনিসের হুজ্জিয়্যাতের ব্যাপারে যেমন মতানৈক্য করে তেমনি হুজ্জিয়্যাতে হাদিসের ক্ষেত্রেও ভ্রষ্টদলগুলো মতানৈক্য করে। সুতরাং তিনটির হুজ্জিয়্যাত একসাথে বুঝে নেওয়া জরুরি।

দ্বিতীয় কারণ হল, আমি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। প্রথমটি সুরা নিসার ১১৫ নং আয়াত। সেখানে ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার সাথে সাথে হাদিসও শরীয়তের দলিল হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হল সুরা নাহল-এর ৪৪ নং আয়াত। সেখানেও কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার সাথে সাথে হাদিসও শরীয়তের দলিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যখন সুরা নিসার আয়াত দ্বারা শুধু ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার কথা প্রমাণ করব তখন অর্ধেক আয়াতের অর্থ বর্ণনা করা হবে। বাকি অর্ধেক আয়াত, যেখানে হুজ্জিয়্যতে হাদিসের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে বর্ণনা করবো। এমনিভাবে যখন সুরা নাহল-এর আয়াত দিয়েও হুজ্জিয়্যতে কিয়াস প্রমাণ করব তখনও অর্ধেক আয়াতের অর্থ বর্ণনা করা হবে। যেহেতু সেখানেও হুজ্জিয়্যতে হাদিসের বর্ণনা রয়েছে, তাই তাও আমাকে বর্ণনা করতে হবে। এই কারণেই আমি আমার পক্ষ থেকে শিরোনামে একটি ছোট্ট সংশোধনী এনেছি। সুতরাং আজকের মজলিসের আলোচ্যবিষয় 'হুজ্জিয়্যতে হাদিস, ইজমা ও কিয়াস'।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের পথনির্দেশের জন্য এবং সংশোধনের জন্য দীন ও শরীয়ত দুটি জিনিস অবতীর্ণ করেছেন। দীন হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে খাতামুন-নাবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত একই ছিল। পৃথক পৃথক দীন আসেনি। আর এই দীনের নাম ইসলাম। আর শরীয়ত বিভিন্ন যমানায় পৃথক পৃথকভাবে এসেছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের শরীয়ত, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শরীয়ত, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত ইত্যাদি। এই শরীয়তগুলো ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তবে সকল নবীর দীন বা আদর্শ একই ছিল।

এই বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এইভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মতো। একটি হল সহোদর ভাই, যেখানে ভাইদের মা-বাবা একই থাকেন। আরেকটি হল বৈমাত্রেয় ভাই, যাতে শুধু পিতা এক থাকেন, মা ভিন্ন থাকেন। আরেকটি হল বৈপিত্রেয় ভাইবোন, যাতে শুধু মা এক থাকেন, পিতা ভিন্ন থাকেন। রাসূলুল্লাহ আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আমরা নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই। অর্থাৎ নবীদের দীন এক। মাতাগণ পৃথক পৃথক অর্থাৎ শরীয়ত ভিন্ন।

এখানে একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দীন একটি আর তা হল ইসলাম। তা হলে সবাইকে মুসলমান বলা হয় না কেন? শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে মুসলমান বলা হয় কেন? হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে মুসলমান বলা হয় না; বরং ইহুদী বলা হয়। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের নাম মুসলমান নয়; বরং তাদের নাসারা বলা হয়।

এর উত্তর হল, আল্লাহ তায়ালার করুণা হল, একমাত্র আমাদেরই মুসলমান বলা হয়। এ ধারাবাহিকতায় এই উম্মতের উপর সবচেয়ে বড় দয়া হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আছে, তিনিই এই উম্মতের জন্য 'উম্মাতুন মুসলিমাতুন' বা মুসলিম উম্মাহ নামটি নির্বাচন করেছিলেন। কুরআনেও এই নামের উল্লেখ আছে। এ কারণেই এটি এই উম্মতের নাম হয়েছে। আর অন্যান্য উম্মত অন্য উপাধি পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দারুল উলুম দেওবন্দ, মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর, আল-বাকিয়্যাতুস্ সালিহাত ভেলর, এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে একই দীন পড়ানো হয়। কিন্তু কাউকে 'কাসেমী' কাউকে 'মাজাহেরী' আবার কাউকে 'বাকবী' বলা হয়। এর দ্বারা এমন বুঝা যাবে না যে, এই তিন প্রতিষ্ঠানে তিনটি ধর্ম পড়ানো হয়। এমনিভাবে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দীন এসেছে সব একই দীন। কিন্তু ইহুদীদের পয়গাম্বর বলেছেন,

إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ[৫]

এরপর থেকেই তার উম্মতের নাম ইহুদী হয়ে গেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

---

৫. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬।

مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَی اللّٰهِ

আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?[৬]

তখন থেকেই তার উম্মতের নাম নাসারা হয়ে গেছে। তাদের পয়গাম্বর যে শব্দ উচ্চারণ করেছেন সেটাই তাদের নাম হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন সেই দীনকে কুরআনে বলা হয়েছে,

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক।[৭]

যিনি আমাদের মহান নেতা (হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) তিনি এই উম্মতের জন্য 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যথা,

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও।

মোটকথা প্রত্যেক উম্মতের বড় ব্যক্তি যে নাম ব্যবহার করেছেন তাই সেই উম্মতের নাম হয়ে গেছে।

এই নামগুলোর পার্থক্য দ্বারা আপনি একথা মনে করবেন না যে, তাদের সকলের দীন আলাদা ছিল। বরং সকল নবীর দীন একই ছিল। তবে শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। শরীয়ত এবং দীনের মধ্যে মূলনীতি ও শাখাগত সম্পর্ক এবং সংযোগ রয়েছে। দীন হল মূল আর শরীয়ত হল তার শাখা। শরীয়তের মধ্যে যুগ-কাল ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। দীনের মধ্যে মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কেননা দীন হল মূলনীতি। আর মূলনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। এই কারণে দীন ভিন্ন হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে বিভিন্ন

৬. সুরা সফ, আয়াত ১৪।

৭. সুরা হজ, আয়াত ৭৮।

যমানায় ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে তার মধ্যে মতানৈক্য অনিবার্য। এ বিষয়টি আরেকটু বিস্তৃত করা হল।

আল্লাহ এক। তিনিই প্রকৃত ও সত্য ইলাহ। আল্লাহ তায়ালাই প্রতিপালনকারী। আল্লাহ তায়ালাই মানুষের রুহানী প্রয়োজন যথাযথভাবে পূর্ণ করার জন্য আসমান থেকে পথনির্দেশের ধারা চালু করেছেন। তার নাম হল রিসালাত। প্রত্যেকেরই মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর পর চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে না; বরং একদিন (কিয়ামতের দিন) জীবিত হতে হবে। নিজের ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পেতে হবে। এখানে দীনের তিনটি বুনিয়াদি আকিদার আলোচনা করা হয়েছে- তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত।

কেউ আল্লাহ এক মানে। এই কারণে আল্লাহ এক। কেউ দুই খোদা মানে। এই কারণে খোদা দুইজন। কেউ সাতজন মানে। এই কারণে খোদা সাতজন। কেউ বিশ কোটি মাবুদ মানে। এই কারণে মাবুদ বিশ কোটি। لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ। এগুলো আবার কেমন আকিদা-বিশ্বাস? এ কারণে মূলনীতি ও আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। বাস্তব ও প্রকৃত যেসব বিষয় আছে, সেগুলো মানার নাম হল আকিদা।

এই মূলনীতির উপরই শরীয়তের শাখা-প্রশাখা বের হয়। তাতে যুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। যেমন, হযরত আদম আলাইহিস সালামের যমানায় বোনের সাথে বিবাহ বৈধ ছিল। কেননা সেকালে বোন ব্যতীত কোনো নারীর কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। অতঃপর যখন কন্যার সংখ্যা বেড়ে গেল তখন বোনের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে গেল। দেখুন, হযরত আদম আলাইহিস সালামের শরীয়ত এবং পরের শরীয়তের মধ্যে মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কোনো উম্মতের জন্য তিন ওয়াক্ত নামায ছিল। আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত হয়ে গেল। এগুলো হল মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার ধরন। কোনো উম্মতের উপর তিনটি রোযার নির্দেশ ছিল। আমাদের উপর একমাস রোযার নির্দেশ হয়েছে। এগুলো লোকদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখার ধরন। কোনো উম্মতের উপর যুলুমের বদলা (প্রতিশোধ) নেওয়া জরুরি ছিল। তারা ক্ষমা করতে

পারত না। আর কোনো উম্মতের উপর এমন নির্দেশ ছিল যে, ক্ষমা করা জরুরি। বরং এক থাপ্পড় যদি এক দিকে মারত তখন দ্বিতীয় গালও পেতে দিতে হত, যেন আরেকটি থাপ্পড় মারতে পারে। আমাদের শরীয়তের ক্ষেত্রে উভয় প্রান্ত একত্র করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমা করে দিবে অথবা চাইলে প্রতিশোধ নিবে। সুবহানাল্লাহ! এগুলো মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার দৃষ্টান্ত। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা করার কারণেই শরীয়ত ভিন্ন হয়ে গেছে।

আহলে কুরআন ফিরকা

এখন এ কথাটি বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা যে দীন এবং যে শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন তা কোন্ কোন্ মাধ্যমে, কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে এবং কোন্ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে এই কথা জানা আবশ্যক যে, তিনটি বিষয় তথা কুরআন, হাদিস এবং ইজমায়ে উম্মতের ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত যে, এগুলো শরীয়তের দলিল। কুরআনুল কারিম দ্বারা দীনও সাব্যস্ত হয় এবং শরীয়তও সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সর্বপ্রথম মতবিরোধ সৃষ্টি হল, কুরআনুল কারিমের পর এমন আর কোনো দলিল-প্রমাণ আছে কি না, যা দিয়ে দীন ও শরীয়ত সাবস্ত্য হতে পারে? তখন একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা বলল, কোনো কিছুই দলিল নয়। শুধু কুরআনুল কারিমই দলিল। তার দ্বারা দীনও সাব্যস্ত হবে এবং শরীয়তও সাব্যস্ত হবে। এই দলটি প্রথম শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দলটির ব্যাপারে আগেই সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি يُوْشِكُ শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ খুব দ্রুত এই দলটি অস্তিত্ব লাভ করবে। হযরত মিকদাদ ইবনে মাদিকারাব রা. থেকে বর্ণিত আছে,

أَلاَ إِنِى أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهٗ مَعَه أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى أَرِيْكَتِه يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

শোন, আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ দেওয়া হয়েছে। ওহে শুনে রাখ, একজন পরিতৃপ্ত লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা এই কুরআন মজবুতভাবে ধারণ কর। তার মধ্যে যা হালাল আছে তাকে হালাল মনে কর এবং যা হারাম আছে তাকে হারাম মনে কর। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল হারাম করেছেন যেমন আল্লাহ হারাম করেন।[৮]

আর হযরত ইরবায ইবনে সারিয়্যা রা. এর হাদিসের শব্দগুলো এই রকম,

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ، أَلاَ ! وَإِنِّي وَاللهِ! قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ، وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ.

তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার আসনে হেলান দিয়ে ধারণা করে, আল্লাহ তায়ালা শুধু ওই জিনিসগুলোই হারাম করেছেন, যা এই কুরআনে আছে? শোন, আল্লাহর কসম, আমি যা আদেশ করি এবং উপদেশ প্রদান করি এবং অনেক বিষয় থেকে বারণ করি। নিঃসন্দেহে তা কুরআনের সমান অথবা তার চেয়েও বেশি।[৯]

সুতরাং যারা শুধু কুরআনকেই দলিল মানে এবং হাদিসের মাধ্যমে যেই আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো অস্বীকার করে তারা পথভ্রষ্ট দল।

এই দলটি প্রথম শতাব্দীতে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং এখনও বিদ্যমান আছে। পাকিস্তানে এদের সংখ্যা অধিক। হিন্দুস্তানেও আছে। আপনাদের এলাকায় আছে কি না তা আমার জানা নেই। আমাদের দেওবন্দের পাশে সাহারানপুর, সেখানেও এই দলটি সক্রিয় আছে। এইসব লোক বলে কুরআনই যথেষ্ট। আর তারা তাদের নাম রেখেছে আহলে কুরআন অর্থাৎ কুরআন মান্যকারী। আরে, তোমরা একা কীভাবে আহলে কুরআন হবে? কুরআনুল কারিম তো পুরো উম্মতই মানে (নাম নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হওয়া উচিত যে, তা যেন অন্যের মধ্যে পাওয়া না যায়)।

---

৮. মেশকাত, হাদিস নং- ১৬৩

৯. মেশকাত, হাদিস নং- ১৬৪।

তোমরা আহলে কুরআন হতে পার না, তোমরা হলে মুনকিরীনে হাদিস তথা হাদিস অস্বীকারকারী দল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগত বিষয়কে তোমরা অস্বীকার কর। এই কারণেই তোমাদের নাম 'মুনকিরীনে হাদিস'। এ দলটি আজও বিদ্যমান। এই দলটির সামনেই আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, হাদিসও শরীয়তের দলিল। আর এজন্যই আমি শিরোনামের মধ্যে কথাটি বৃদ্ধি করেছি।

শিয়াসম্প্রদায় সবচেয়ে বড় মুনকিরীনে হাদিস

এখানে আমি একটি বিশেষ কথার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সম্ভবত সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি। লোকজন সাধারণত আহলে কুরআন এবং মুনকিরীনে হাদিস ওই দলকেই বলে, যারা হাদিসকে দলিল মানে না। কিন্তু এই কথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, সবচেয়ে বড় মুনকিরীনে হাদিস হল শিয়াসম্প্রদায়। প্রশ্ন হতে পারে কেন? কারণ তারা বুখারী শরিফকে মানে না। মুসলিম শরিফ, আবু দাউদ শরিফ, তিরমিযী শরিফকে মানে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সংকলিত যত হাদিসের কিতাব আছে, সেগুলোকে তারা মানে না। তাদের হাদিসের কিতাব আলাদা। যদি তারা এই হাদিসের কিতাবগুলোকে মানত তা হলে পৃথকভাবে কিতাব লেখার কী প্রয়োজন ছিল? শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আলী রা. খলিফা ও ইমাম হয়ে গেছেন। তার পর ইমাম হয়েছেন হযরত হাসান রা.। তার পর হযরত হোসাইন রা.। তাদের আরেকটি আকিদা হল, তাদের বার ইমামের নিকট অহী আসে। সেইসাথে আহকামও অবতীর্ণ হয়। ইমামের সেই অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকাম বিলুপ্তও হতে পারে। এগুলো তাদের আকিদা।[১০] আমাদের নিকট যেমন বুখারী শরিফের মর্যাদা, অনুরূপ তাদের

---

১০ কিন্তু কাদিয়ানীরা যেভাবে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে, শিয়ারা বার ইমামকে সেভাবে নবী বলে না। তবে সেই বারো ইমামের জন্য নবুওয়াতের সকল নিদর্শন সাব্যস্ত করে। তারা অহী মান্য করে। সেই অহীর হুকুম-আহকামও মানে। তাদের অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকাম বিলুপ্তও হতে পারে।

নিকট ইয়াকুব কিলাইনীর লিখিত চার খণ্ডে ‘আলকাফী’ গ্রন্থের মর্যাদা। তার মধ্যে শতকরা দশভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আর নব্বইভাগ তাদের ইমামদের কথা। তাদের কাছে ইমামদের এই কথাবার্তাও হাদিস ও অহী হিসাবে গণ্য। তারা আমাদের নব্বইভাগ হাদিসই গ্রহণ করে না। সুতরাং এই শিয়াসম্প্রদায়ও মুনকিরীনে হাদিস, এ কথাটি অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। তাই আহলে কুরআন তথা মুনকিরীনে হাদিসের শরয়ী যে হুকুম রয়েছে, শিয়াসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সে হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

এই দুটি দল তথা মুনকিরীনে হাদিস এবং শিয়াসম্প্রদায় হাদিসকে শরয়ীতের দলিল মানে না। এই দুই দল ব্যতীত পুরো মুসলিম উম্মাহ কুরআনের পর হাদিসকেও শরয়ী দলিল মানে। অর্থাৎ যেভাবে কুরআন দ্বারা দীন সাব্যস্ত হয় এবং শরীয়তের হুকুম সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে হাদিস দ্বারাও দীন সাব্যস্ত হয় এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম সাব্যস্ত হয়।

আহলে হাদিস ও তাদের ইজমা

অতঃপর আরেকটি বিষয়ে মতবিরোধ শুরু হল। তা হল পূর্বে উল্লেখকৃত দুটি দলিলের পরও মান্য করা আবশ্যক এমন আর কোনো দলিল আছে কি না? বহুদিন পূর্বেই নতুন একটি দলের জন্ম হয়। তারা বলে কুরআন ও হাদিসের পর তৃতীয় কোনো দলিল নেই। তারা ইজমায়ে ইম্মত অস্বীকার করে এবং বলে, এটি শরীয়তের দলিল হিসাবে গণ্য নয়। তারা ইংরেজ গভর্নমেন্ট দ্বারা তাদের নাম পাল্টিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের নাম রেখেছে ‘আহলে হাদিস’। তারা তাদের এই নাম দ্বারা নিজেদের আহলে কুরআন থেকে পৃথক করে নিয়েছে। তারা বলে, আমরা শুধু কুরআনকেই দলিল মানি না বরং কুরআনের সাথে সাথে হাদিসকেও দলিল মানি।

যে দল যেখানে আটকে গেছে তারা সেখানেই থেমে গেছে। তারা নিচের বিষয় মানবে না। ‘আহলে কুরআন’ কুরআনের উপর আটকে গেছে। তারা হাদিস মানে না। ইজমা এবং কিয়াস মানে না। ‘আহলে হাদিস’ হাদিসের উপর আটকে গেছে। তারা ইজমা মানে না। কিয়াসও মানে না। তাদের

কী নাম দেওয়া হবে? এইসব ফিতনাবাজের জন্য উপযুক্ত কোনো নাম নেই। 'আহলে কুরআন'রা তাদের নাম রেখেছে আহলে কুরআন। এটা ভুল এবং সামঞ্জস্যহীন হয়েছে। এজন্য আমরা তাদের নাম দিয়েছি 'মুনকিরীনে হুজ্জিয়্যতে হাদিস', যা যথার্থ হয়েছে।

কিন্তু ওই দলটি আশ্চর্য প্রকৃতির। তারা তাদের জন্য যে নাম রেখেছে, তা তাদের সাথে মানায় না। আমরা তাদের যে নাম দিয়েছি তাও তাদের জন্য মানানসই হয় না। আমরা তাদের বলি 'গায়রে মুকাল্লিদ'। অথচ তারা আমাদের চেয়েও পাক্কা মুকাল্লিদ। এই দলটি যেহেতু কিয়াস মানত না এজন্য তাদের নাম প্রাথমিকভাবে 'আসহাবে জাওয়াহের' রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারা এই নাম পছন্দ করে না। আসহাবে জাওয়াহের অর্থ কুরাআন-হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী। যখন আমাদের দেওয়া এই নাম তাদের পছন্দ হল না তখন তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইংরেজগভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত দিয়ে নিজেদের নাম পাল্টিয়ে নিল। তারা তাদের জন্য 'আহলে হাদিস' নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে নিল। অতঃপর সময়ের পালা বদল হল। সৌদি আরবে পেট্রো-ডলারের সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তারা তাদের 'আহলে হাদিস' নাম ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নাম রাখল সালাফী। মোটকথা কোনো নাম এই দলটির সাথে সঠিকভাবে যুক্ত হতে পারছে না। এইসব লোক মোটেই গায়রে মুকাল্লিদ নয়। তারা আমাদের চেয়েও পাক্কা মুকাল্লিদ।

আমরা যে চারজন ইমামের তাকলিদ করি। আবার আমরা একে অপরের কাছে মাসআলাও জিজ্ঞেস করি। প্রয়োজনের সময় একে অপর থেকে মাসআলা গ্রহণ করে থাকি। আমি ইউরোপ-আমেরিকা যাই। ওখানে যত শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী আছে তারা আমার কাছে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করে। কেননা সেখানে কোনো শাফেয়ী আলেম নেই। আমি তাদের মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা বলে দিই।

আমাদের ফিকাহ থেকে হারিয়ে যাওয়া 'শাওহার এবং মুতাআন্নাত শাওহার'এর মাসআলা হযরত থানবী রহ. 'আলহিলাতুন-নাজিযাহ'গ্রন্থে ফিকহে মালেকী থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ওই দলটার কোনো লোক

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী কোনো আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেসই করতে পারে না। তাদের ধ্যান-ধারণা হল, তারা শুধু কোনো আহলে হাদিস বা সালাফী আলেমের কাছেই মাসআলা জিজ্ঞেস করবে। এই গণ্ডি থেকে তারা কখনোই বের হবে না। সুতরাং আমরা মুকাল্লিদ না তারা? সুতরাং তাদের গায়রে মুকাল্লিদ বলাটা যথাযথ নয়।

মুকাল্লিদগণ তো হক ইমামদের তাকলিদ করে। কিন্তু এই লোকগুলো ওই ইমামদের তাকলিদ করে, যারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। আরববাসী তাদের একটি নাম দিয়েছে, তা হল 'লা-মাযহাবী'। এই শব্দটি গায়রে মুকাল্লিদ-এর আরবি অর্থ। এ নামটিই সবচেয়ে যথার্থ। কিন্তু উর্দুভাষায় যদি তাদের 'লা-মাযহাবী' বলা হয় তা হলে শুদ্ধ হবে না। আজ থেকে বহুদিন আগে কেউ তাদের লা-মাযহাবী বলেছিল। তখন তারা খুব রাগ করেছিল। তারা বলেছিল, আমরা কি মুসলমান নই? (আমাদের লা-মাযহাবী বল কেন?)। সুতরাং আরবিভাষায় তো তাদের লা-মাযহাবী বলা যায়। এটি গায়রে মুকাল্লিদের অনুবাদ। কিছু শব্দ এমন আছে আরবিভাষায় যেগুলোর অর্থ এক। কিন্তু উর্দুভাষায় তার অর্থ পাল্টে যায়। আরবিভাষায় 'মাযহাব' বলা হয় 'মাসলাক' বা চলার পথকে। কিতাবে এসেছে,

كَذَا فِيْ مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، كَذَا فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، كَذَا فِيْ مَذْهَبِ مَالِكٍ

এখানে 'মাযহাব' শব্দটি 'মাসলাক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উর্দুভাষায় 'মাযহাব' শব্দটি মাসলাক অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং তা দীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'তালিমুল ইসলাম' কিতাবের শুরুতে আছে,

سوال : تم کون ہو؟

মাযহাবের দিক থেকে তোমাদের পরিচয় কী?

جواب : مسلمان

সুতরাং উর্দুভাষায় মাযহাব শব্দটি দীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই উর্দুভাষায় লা-মাযহাব বলা শুদ্ধ নয়। আরবিভাষায় শুদ্ধ।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত

উম্মতের বড় একটি দল। তাদের নাম হল 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত'। কেননা কুরআন তো সবাই মানে। আমরা কুরআনের পরে সুন্নতকেও মানি (শুধু হাদিসকে নয়। হাদিসকে না মানার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ একটু পরেই করব। আমরা সুন্নত মান্যকারী, হাদিসকে নয়।) উম্মতের বড় দলটি বলে, আমরা আহলে সুন্নত। আমরা আহলে হাদিস নই। আর 'আলজামাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের জামাত। অর্থাৎ মুসলমান উম্মতের যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে আমরা তাও মানি। আর এই কারণেই আমরা 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত'।

হাদিস ও সুন্নতের পার্থক্য

হাদিস কী এবং সুন্নত কাকে বলে? আর উভয়ের মাঝে কী পার্থক্য? এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং সহজ একটি বিষয়। আলেমদের নিকট আবেদন হল, খুব ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করবেন।

হাদিস চারটি জিনিসের নাম। ১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যা তিনি ইরশাদ করেছেন। (যেমন, যখন নবীজির নাম নেওয়া হয় তখন উচ্চৈঃস্বরে দুরুদ পড়া উচিত। এতে মজলিস নুরানী হয়ে যাবে)। ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম। অর্থাৎ তার কৃত কাজসমূহ। ৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকরির ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ তার সামনে কোনো মুসলমান কোনো কাজ করল। আর তিনি তা দেখে অস্বীকার করলেন না এবং তা থেকে বাধা দিলেন না। তা হলে এটি তাকরিরী হাদিস। ৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা ও গুণাবলি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক এমন ছিল, চুল এমন ছিল, দাঁত মুবারক এমন ছিল, দেহ মুবারক এমন ছিল, তার চাল-চলন এমন ছিল। তিনি ঘুমাতেন এভাবে। এই হল নবীজির গুণাবলি। এই চার জিনিসের নাম হাদিস।

আর সুন্নত দ্বারা ফরয-ওয়াজিবের পর যে সুন্নত আছে সেই সুন্নত উদ্দেশ্য নয়। আহলুস সুন্নাহ দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, তারা ফরয-ওয়াজিবের

সাথে সাথে সুন্নতও মানে। তারপর মুসতাহাব মানে না বরং 'সুন্নত' অর্থ হল اَلطَّرِيْقَةُ الْمَسْلُوْكَةُ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনী রাস্তা।

সুতরাং হাদিস এবং সুন্নতের মধ্যে আম-খাস মিন ওয়াজহিন-এর নিসবত (সম্পর্ক)। এই পরিভাষাটি আলেমদের বুঝার কথা। আর যেখানে আম-খাস মিন ওয়াজহিন-এর নিসবত সেখানে তিনটি মাদ্দা পাওয়া যায়। দুটি ইফতেরাকী (বিচ্ছিন্ন) এবং একটি ইজতেমায়ী (সমন্বিত)।

প্রথম ইফতেরাকী মাদ্দা : ওই সকল হাদিস, (তা বাণী হোক বা কার্যাবলি) যা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস (নির্দিষ্ট)। সেসব হুকুম উম্মতের জন্য নয়। যেমন, সওমে বিসাল (ধারাবাহিক রোযা পালন), চারের অধিক বিবাহ, এজাতীয় বিষয়গুলো হাদিস কিন্তু সুন্নত নয়।

দ্বিতীয় ইফতেরাকী মাদ্দাঃ খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন। তারা দেশ ও জাতির নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্য যে কাজগুলো করেছেন সেগুলোও সুন্নত, কিন্তু হাদিস নয়। হযরত উমর রা. এর যুগে বিশ রাকাত তারাবির নামাযের বিধান। হযরত উসমান রা. এর যমানায় জুমার একটি আযান বৃদ্ধি করা, এগুলো সুন্নত কিন্তু হাদিস নয়।

হযরত আলী রা. এর জারিকৃত সুন্নত

মানুষ মনে করে থাকে হযরত আলী রা. কোনো সুন্নতের প্রচলন ঘটাননি। অথচ হযরত আলী রা. এতো বড় সুন্নতের প্রচল ঘটিয়েছিলেন, যা আমরা ধারণাও করতে পারব না। সেই সুন্নত হল, যখন দুটি মুসলিমবাহিনী পরস্পর যুদ্ধ করবে, তখন তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হবে।

এক. দুই দলের যারা মারা গিয়েছে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে?

দুই ও তিন. যখন এক দল পরাজিত হয় এবং অপর দল জয়ী হয় তখন পরাজিত বাহিনীর বন্দী ও মাল হাতে আসে। এই অবস্থায় সেই সম্পদ গনিমতের মাল হিসাবে বিজয়ী বাহিনীর মাঝে বণ্টন করা যাবে কি না? আর যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের দাসী-বাঁদি বানানো জায়েয হবে কি না? এই সকল বিষয়ে হযরত আলী রা. ফয়সালা করে গেছেন।

হযরত আলী রা. এর যমানায় মুসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমে জঙ্গে জামাল সংঘটিত হয়েছে। এতে বহু মুসলমান বন্দী হয়েছিল। হযরত আয়েশা রা.-ও বন্দীদের মাঝে ছিলেন। আর মালে গনিমতও হাতে এসেছিল। হযরত আলী রা. এর সেনাবাহিনী বলল, মালে গনিমত বণ্টন করুন। হযরত আলী রা. বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন হতভাগা কে আছে, যে হযরত আয়েশা রা. কে তার দাসী বানাবে? গনিমতের মাল যদি বণ্টন হয় তা হলে বন্দীদেরও দাসী-বাঁদি বানাতে হবে। তখন সবাই চুপ হয়ে গেল এবং সিদ্ধান্ত হল, যুদ্ধলব্ধ মালও বণ্টন হবে না। আর বন্দীগণও দাসী-বাঁদি হবে না। সুতরাং হযরত আলী রা. পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে হযরত আয়েশা রা. কে মদিনায় পৌছে দিলেন। অন্যান্য যারা বন্দী হয়েছিলেন তাদেরও ছেড়ে দিলেন আর যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মাল তাদের উত্তরাধিকারদের নিকট পৌছে দিলেন। আর যারা ময়দান থেকে পলায়ন করেছিলেন তাদের মাল-সম্পদও তাদের ঘরে ঘরে পৌছে দিলেন। জানা গেল যখন মুসলমানদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধ করে তখন তাদের মাল গনিমত হয় না এবং তাদের বন্দীদের দাসী-বাঁদি বানানো যাবে না।

অতঃপর দ্বিতীয়বার জঙ্গে সিফ্‌ফীন সংঘটিত হল হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে। হযরত আলী রা. কে জিজ্ঞেস করা হল উভয়পক্ষের লোক মারা যাচ্ছে। কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামে যাবে? তখন হযরত আলী রা. উত্তর দিলেন,

قَتْلَانَا وَ قَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ

আমাদের যেসকল লোক মারা যাচ্ছে তারাও জান্নাতে যাবে এবং মুয়াবিয়ার পক্ষের যারা মারা যাচ্ছে, তারাও জান্নাতে যাবে।

লক্ষ্য করুন, এমন একটি বিষয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ফয়সালা করতে পারত না। হযরত আলী রা. ফয়সালা করে দিলেন। কেননা সকল সাহাবা শুধু মুক্তিপ্রাপ্তই নন বরং জান্নাতের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। এই কথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট সর্বজনবিদিত। আর হযরত আলী রা. এর বাহিনীতে সাহাবী ও গায়রে সাহাবীও ছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনীতেও সাহাবী ও গায়রে সাহাবী ছিলেন। এ দিকের যারা মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে সাহাবী ও গায়রে সাহাবী উভয় দলই শহীদ। ওই দিকে যারা মারা গেছেন তাদেরও সাহাবী ও গায়রে সাহাবী উভয়ই শহীদ। সুতরাং সাহাবায়েকেরামের জান্নাতী হওয়ার বিষয় তো চূড়ান্ত। এই দিকের সাহাবীগণও জান্নাতে যাবেন। ওই দিকের সাহাবীগণও জান্নাতে যাবেন। এরপর যারা সাহাবা নন তারা কীভাবে জাহান্নামে যেতে পারেন? সুতরাং তাদের এবং এদের জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। তাই মাসআলা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার অর্থাৎ قَتْلَانَا وَ قَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ।

আমি এই উদাহরণগুলো এই জন্য দিচ্ছি যে, এ বিষয়টি লোকদের অন্তরে আসেই না। তারা ভাবে, হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা. তো অনেক সুন্নতের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী রা. কোনো সুন্নতের প্রচলন ঘটাননি। হযরত আলী রা. এমন সুন্নত প্রচলন করে গেছেন, যদি তিনি তা না করতেন তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত সেই মাসআলাগুলো অমীমাংসিত থেকে যেত। মোটকথা খুলাফায়ে রাশেদীন উম্মতের সুবিধা ও শৃঙ্খলার জন্য যেই আহকাম (শরীয়তের নির্দেশমালা) চালু করে গেছেন, এর সবগুলোই সুন্নত। সেগুলো হাদিস বলা যাবে না।

মাদ্দায়ে ইজতেমায়ী: আর যেসকল হাদিসের আমল করা হচ্ছে, মানসুখ (রহিত) বা খাস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট) নয় সেগুলোও সুন্নত এবং হাদিস।

সুতরাং আমরা আহলে হাদিস নই, আমরা হলাম আহলে সুন্নত। যেসকল হাদিসের উপর আমল করা হচ্ছে আমরা সেগুলোকে মানি। আবার খুলাফায়ে রাশেদীন-এর সুন্নতও মানি। এই জন্য আমরা আহলে সুন্নত। আমরা যদি আমাদের নাম 'আহলে হাদিস' রেখে দিতাম তা হলে দুটি ক্ষতি হত।

প্রথম ক্ষতি

যেসব হাদিস রহিত কিংবা স্থগিত হয়ে গেছে, সেগুলোর উপরও আমল করতে হত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে

হাদিসগুলো খাস, তার উপরও আমল করতে হত। অথচ সেগুলো আমলের জন্য নয়।

দ্বিতীয় ক্ষতি

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত গ্রহণ করা যেত না। অথচ হাদিস শরিফে তাদের সুন্নত মনে-প্রাণে গ্রহণ করার নির্দেশ এসেছে। এই কারণে আমরা আহলে হাদিস নই; বরং আমরা হলাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রইল, কোনো একটি এমন হাদিস নিয়ে এসো, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাদিস'কে শক্তভাবে ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন। একটি হাদিসও এমন নেই। যত হাদিস আছে সবগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতকে শক্তভাবে ধারণ করতে বলেছেন। শুধু নিজের সুন্নতই ধারণ নয় বরং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতও ধারণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْابِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

ভালোভাবে খেয়াল করুন عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ বলেছেন عَلَيْكُمْ بِحَدِيْثِيْ বলেননি। আরও ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ...،

এখানেও কিন্তু مَنْ تَمَسَّكَ بِحَدِيْثِيْ বলেননি।

আরও ইরশাদ করেন,

إِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِيْ.

তিনি এখানে اَحَادِيْثِىْ বলেননি। নিঃসন্দেহে হাদিস মুখস্থ করার ফযিলত রয়েছে। কিন্তু হাদিসসমূহ শক্তভাবে ধারণ করার হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি। হাদিসভাণ্ডারে একটি হাদিসও

এমন নেই। যত হাদিস এ ব্যাপারে আছে সবগুলোতেই সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত।

হযরত আবুবকর রা. এর সুন্নত

আল্লাহর অশেষ রহমতে এ মজলিসে তালিবে ইলমও আছে। কোনো বিষয় যদি অপূর্ণ রেখে দেওয়া হয়, তা হলে সবকের পর তালিবে ইলমরা পিছু নেয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। তারা এই প্রশ্নটিও করতে পারে যে, আপনি তো হযরত উমর রা. এর সুন্নত বললেন- তারাবির নামায। হযরত উসমান রা. এর সুন্নত বললেন- জুমার দ্বিতীয় আযান এবং হযরত আলী রা. এর সুন্নতও বললেন। কিন্তু হযরত আবুবকর রা. কোন্ সুন্নত জারি করলেন তা তো বলেননি?

হযরত আবুবকর রা. এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত রয়েছে। সম্ভবত পরবর্তী কোনো খলিফা ওই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতের প্রচলন করতে পারতেন না। একটি সুন্নত হল, কোনো স্থানের সকল লোক একত্রে যদি ইসলামের কোনো নিদর্শন ছেড়ে দেয়, তা হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। যাকাত একটি ফরয বিধান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় যাকাত প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনগণ হতে আদায় করা হত। এই পদ্ধতিটি সেসময়ে ইসলামের একটি নিদর্শন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর কিছুলোক বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত দিতাম। এখন আমরা আবুবকর রা. কে যাকাত দেব না। যাকাতের অর্থ আমরা আমাদের মনমতো ব্যয় করব। হযরত আবুবকর রা. সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় কেউ একটি রশি দিত আর এখন তা দিতে অস্বীকার করে তা হলে আমি তার সাথেও যুদ্ধ করব। হযরত আবুবকর রা. এর এই সিদ্ধান্ত হযরত উমর রা. এর বুঝে এলো না। কেননা তখন চারদিকেই বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবায়ু বইছিল। মুরতাদ হওয়ার প্রবণতা বিস্তার লাভ করছিল। এজন্য সাধারণ বিষয় নিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন ছিল না। হযরত উমর রা. আবেদন করলেন,

হযরত, এখনোই তাদের সাথে যুদ্ধ না করা হোক। হযরত আবুবকর রা. তাকে তিরস্কার করে বললেন,

أَجَبَّارٌ فِى الجَاهِلِيَّةِ ؟ وَ خَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ؟

জাহেলী যুগে বীরপুরুষ ছিলে আর এখন ভেজা বিড়াল সেজেছ?

মোটকথা হযরত আবুবকর রা. সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে দিলেন। যদি হযরত আবুবকর রা. এই সমস্যার সমাধান না করে যেতেন তবে পরবর্তী খলিফাগণ সামধান করতে পারতেন না। দেখতে সাধারণ বিষয় মনে হয় কিন্তু উম্মতের শৃঙ্খলা আর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তা ছিল অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কোনো এলাকার লোকেরা আযান দেয় না। তারা সিদ্ধান্ত নিল আযান দেবে না। কোনো এলাকার লোক খতনা করায় না। তা হলে এখন কি তাদের অবস্থার উপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? চাইলে খতনা করবে, চাইলে করবে না। আযান দেওয়া হোক বা না হোক, নামায আদায় করছে এটাই তো যথেষ্ট। এগুলো ছোট-খাট বিষয়। কিন্তু উম্মতের শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এগুলো ছোট-খাট বিষয় নয়। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন, যাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন পড়েনি। সেনাবাহিনী পৌছামাত্র লোকেরা মেনে নিয়েছে। তারা যাকাত দেওয়ার বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে।

আরেকটি সুন্নত হল, হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. তার পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করে গেছেন। একটি চিঠি লিখলেন, আমার পর খলিফা হবে উমর। চিঠি বন্ধ করে দিলেন। খাম বন্ধ করে মোহর এঁটে দিলেন। হযরত উসমান রা. কে ডেকে বললেন, মসজিদে লোকদের একত্র কর এবং এই খামের ভিতর ভবিষ্যৎ খলিফার নাম লেখা আছে। তুমি তার জন্য সকলের বায়আত গ্রহণ কর। নাম বলেননি। এই খাম খোলা হবে হযরত আবুবকর রা. এর ইনতেকালের পর। সুতরাং সকল সাহাবী বায়আত হলেন। যখন হযরত আবুবকর রা. এর ইনতেকাল হল তখন খাম খোলা হল। সেখানে হযরত উমর রা. এর নাম ছিল। এই বিষয়টি তথা খলিফার নাম নির্ধারণ করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন হযরত

আবুবকর রা.। এটা অন্যকারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং খলিফা নির্ধারণের যে তিন-চারটি পদ্ধতি রয়েছে এর মধ্যে নাম উল্লেখ করাও একটি। এর স্পষ্ট কোনো দলিল কুরআন ও হাদিসে নেই। হযরত আবুবকর রা. এই সুন্নত প্রচলন করেছেন।

এখানে তালিবে ইলমরা আবার প্রশ্ন করতে পারে, এই নাম উল্লেখ করা কি হযরত আবুবকর রা.-ই করতে পারতেন? পরবর্তী কোনো খলিফা কেন করতে পারতেন না? তারাও তো সাহাবী ছিলেন এবং খলিফাও ছিলেন?

ভালোভাবে লক্ষ্য কর, সময় যতই আগে বাড়তে থাকবে, উম্মাহর মধ্যে সাহাবীর সংখ্যা ততই কমতে থাকবে। গায়রে সাহাবীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সাহাবীদের তো সহজেই কথা মানিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু গায়রে সাহাবীকে এতো সহজে কথা মানানো সম্ভব নয়। হযরত আলী রা. কে প্রশ্ন করা হল হযরত আবুবকর ও হযরত উমর রা. এর খিলাফত তো এমন ছিল না। সেইসময় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ছিল। কিন্তু আপনার খিলাফতের মধ্যে শুধু ঝগড়া। আপনার খিলাফত এমন কেন? তখন হযরত আলী রা. বললেন, হযরত আবুবকর ও উমর রা. যখন খলিফা ছিলেন, তখন আমি প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আর আমি যখন খলিফা হয়েছি তখন তুমি প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ। তিনি কত গভীর কথা বলেছেন। হযরত আবুবকর রা. ও হযরত উমর রা. যখন খলিফা ছিলেন তখন 'আলী' ছিলেন সাধারণদের অন্তর্গত। আলীর মধ্যে কথা মানার যোগ্যতা ও শক্তি ছিল। আর আমি যখন খলিফা হয়েছি তখন তোমার মতো বক্রপ্রকৃতির কিছুলোক সাধারণদের অন্তর্ভুক্ত হল। আমি বলি অথচ তোমরা তা মান না। সুতরাং আমার খিলাফতকালে ঝগড়া হবে না তো কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের দুই বছর পর হযরত আবুবকর রা. এর ইনতেকাল হয়। তখন একশভাগ লোক সাহাবী ছিলেন। ফলে হযরত আবুবকর রা. ফয়সালা করেছেন আর সাহবীগণ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যদি পরের খলিফাগণ মনোনয়ন করতেন তা হলে লোকেরা মানত না। মোটকথা হযরত আবুবকর রা. দুটি বড় ধরনের সুন্নত জারি করে গেছেন। এটি তারই কৃতিত্ব ছিল। পরের খলিফাগণ তা করতে পারতেন না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর উৎপত্তি

এই চার ইমামের অনুসারীদের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। এই নামটি একটি হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে। হাদিস শরিফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইহুদীদের এতোগুলো দল হয়েছে, নাসারারা এতোগুলো দলে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু আমার উম্মতের মধ্যে তিহাত্তরটি দল হবে। তার মধ্য থেকে একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। বাকিগুলো জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর রাসূল, ওই একটি দল, যা জান্নাতে যাবে, কোন্‌টি? লক্ষ্য করুন। সাহাবাগণ এটি জিজ্ঞেস করেননি যে, ওই বাহাত্তর দলের লোক কারা, যারা জাহান্নামে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেক দীর্ঘ। প্রত্যেক দলের আকিদা বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। বরং ওই একটি দল, যা জান্নাতে যাবে, সেই দলটির ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমরা সকলেই নিজেদের তার মধ্যে শামিল রাখি। আর এর উত্তরও খুব সংক্ষিপ্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ

আমি এবং আমার সাহাবীরা যে পথে আছে।

চিন্তা করুন, مَا أَنَا عَلَيْهِ অর্থাৎ ওই রাস্তা এবং তরিকা যাতে আমি আছি। এমন বলেননি যে, আমার হাদিসসমূহ। আর বলেছেন, وَأَصْحَابِىْ অর্থাৎ যেই রাস্তার উপর আমার সাহাবাগণ আছে। যেই রাস্তার উপর প্রিয়নবী চলেছেন তার নাম হল সুন্নত। আর যেই রাস্তার উপর সাহাবাগণ চলেছেন তার নাম হল ইজমা। এখান থেকেই আমাদের নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া রহ. তার প্রসিদ্ধ 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবীদের ইজমা। আহলে হাদিসদের নবাব ওয়াহিদুয যামান তার 'নুযূলুল আবরার' গ্রন্থে এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইজমায়ে উম্মত। মোটকথা আমরা কুরআনও মানি, তার পর সুন্নতও মানি এবং ইজমায়ে উম্মতও মানি।

শরীয়তের তিনটি মূলনীতি

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুনুন। শরীয়তের উসুল বা মূলনীতি হল তিনটি। কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূলুল্লাহ এবং ইজমায়ে উম্মত। নুরুল আনওয়ার গ্রন্থের মূল মতন 'মানারুল আনওয়ার' এবং 'হুসামী' গ্রন্থে আছে,

اِعْلَمْ اَنَّ أُصُوْلَ الشَّرْعِ ثَلٰثَةٌ: كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ رَسُوْلِه وَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

এরপর এসেছে,

وَالأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الأُصُوْلِ الثَّلَاثَةِ.

চতুর্থ মূলনীতি হল কিয়াস, যা মাসআলা বের করার জন্য বুনিয়াদি তিন মূলনীতি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। দীন-শরীয়ত, ইলমুল কালাম ও ইলমে ফিকাহ যে মূলনীতি থেকে বের করা হয় সেগুলো তিনটি। কিতাব, সুন্নত এবং ইজমায়ে উম্মত। কিন্তু কিয়াস সেই স্তরের নয়। এ কারণেই কিয়াসকে পৃথক করা হয়েছে।

এবার একটি উদাহরণ জেনে নিন। মেহমান দাওয়াত করা হল তিন ডেগচি খাবার রান্না করা হল। পোলাও রান্না করা হল। ঘি দিয়ে গোশত ভূনা করা হল এবং পৃথক একটি ডেগচিতে জর্দা রান্না করা হল। গরম গরম ডেগচি। মেহমান এসে বসে গেল। ডেগচিগুলো থেকে প্লেটে খানা পরিবেশন করতে হবে। এখন কিসের সাহায্যে ভিতর থেকে খাবার বের করবে? হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। খাবার বের করার জন্য একটি লম্বা চামচের প্রয়োজন। লম্বা চামচ দিয়ে ওই ডেগচিগুলো থেকে খাবার বের করা হবে। আর এই চামচই হল কিয়াস এবং তিন ডেগচি গোশত, পোলাও ও জর্দা হল কুরআন, হাদিস ও ইজমায়ে উম্মত। এগুলোতে খাদ্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আছে। কিন্তু হাত দ্বারা বের করা সম্ভব নয়। তাই এমন একটি লম্বা চামচের প্রয়োজন, যা দিয়ে খাবার বের করা হবে এবং মেহমানদের সামনে পরিবেশন করা হবে।

মোটকথা, কিয়াস একটি মাধ্যম (Tool)। এখন যদি আপনি চোখে দেখে ডেগচিতে চামচ প্রবেশ করান তবে তা ঠিক আছে। আর যদি চোখ বন্ধ

করে চামচ প্রবেশ করান, তাতে চামচটি ডেগচিতে প্রবেশ করলো না; বরং ডেগচির বাইরে নিচে পড়ে গেল এবং মাটি পূর্ণ হয়ে চামচটি ফেরত এলো। তা হলে এটা এমন হবে,

أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيْسُ

এই কিয়াস শরয়ী কিয়াস নয়। এটা শয়তানী কিয়াস। কিন্তু যেই চামচ কুরআনের ডেগচিতে গেল এবং ভিতর থেকে পূর্ণ হয়ে এলো তাকে কি ইবলিসের কিয়াস বলা যাবে? যদি তাকে ইবলিসের কিয়াস বলা হয়, তা হলে তো কুরআনকে ইবলিসের কিয়াস বলতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)। যে চামচ হাদিসের ডেগচির ভিতরে গিয়েছে এবং মাসআলা নিয়ে এসেছে তাকে আপনি শয়তানী কিয়াস কীভাবে বলবেন? ইজমায়ে উম্মতের বিষয়টি অনুরূপ। হাদিসে আছে আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্র হবে না। সুতরাং কিয়াস মুসবিত বা সাব্যস্তকারী নয় বরং কিয়াস হল মুযহির বা প্রকাশকারী।

শরীয়তের মূলনীতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেই বিষয়ে আলোচনা করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলোচনা শেষ করতে হবে। কেননা, সময় বেশি নেই। এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। আলেমগণ মন দিয়ে শোনবেন। এরপর অন্তরে তা প্রোথিত করবেন।

এই চার উসূল হলো কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। এর মধ্যে প্রথম তিনটির স্তর স্বতন্ত্র এবং কিয়াসের স্তর ভিন্ন। কিন্তু এই চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এই চারটি মূলত চারটি নয়; বরং এই চার মিলে একটি। কেননা মৌলিকভাবে আসল শরীয়তপ্রণেতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। 'শারে' শব্দের অর্থ হল- শরীয়তপ্রণেতা তথা হুকুম-আহকাম দাতা। এটি শুধু আল্লাহ তায়ালারই অধিকার। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেউ হুকুম-আহকাম দেওয়ার অধিকার রাখে না। সুতরাং এই চারটি জিনিস বিস্তৃত হওয়ার দ্বারা চার হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে জিনিস একটিই।

সকল হাদিস কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এক ওয়াজে একটি হাদিস শোনালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিলা ও মুসতাওসিলা এবং ওয়াসিমা ও মুসতাওসিমার উপর লানত করেছেন। হাদিস অনেক দীর্ঘ। (অর্থাৎ) যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্যের চুল মিলায় এবং যে নারী এই চুলের সাথে চুল মিলানোর ব্যবসা করে অর্থাৎ চুলের সাথে চুল মিলিয়ে চুল লম্বা করে দেয়। উভয়ের উপর আল্লাহর লানত। এমনিভাবে যেসকল মহিলা শরীরে উল্কী আঁকে, গণ্ডদেশে তিল বানায় এবং যারা এই তিল বানানোর ব্যবসা করে উভয়ের উপরই আল্লাহর লানত।

হাদিস বর্ণনা শেষে এক মহিলা বললেন, আপনি আপনার বয়ানে এমন হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা কুরআন শরিফে পাই না। এর দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক হাদিস কিতাবুল্লাহয় থাকা জরুরি। আর আমি এ কথাটিই বুঝাতে চাচ্ছি, সকল হাদিস কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উত্তর দিলেন,

لَوْ قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لَوَجَدْتَ فِيْهِ

> যদি তুমি ভালোভাবে কুরআন পড়তে তা হলে তুমি তা কুরআনে পেয়ে যেতে।

এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রত্যেক হাদিস কুরআনে পাওয়া জরুরি, এটা অস্বীকার করেননি। সেই নারী বলল, আমি কুরআনের হাফেয। কুরআনের কোথাও এই কথা নেই। তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবি। তাই কুরআনের হাফেয, নারী হোক কিংবা পুরুষ, সহজেই তারা কুরআনের বিষয় বুঝতে পারতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তুমি কি কুরআনে এই আয়াত পড়নি?

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের যা দান করেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

এটা শুনে ওই নারী বলল, হ্যাঁ, এই আয়াত তো কুরআনে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লানত করেছেন- এর সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হাদিসকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোনো আলেম ফিরাতে পারে না। এ কাজটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ক্ষেত্রেই মানায়। তিনিই এর উপযুক্ত। তিনিই এই হাদিসকে এই আয়াতের দিকে ফিরিয়েছেন।

ইজমাও কুরআন-হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল

আলেমগণ এই কথা জানেন এবং কিতাবেও এই কথা লেখা আছে যে, কোনো ইজমা সনদবিহীন হতে পারবে না। অর্থাৎ যার মাধ্যমে ইজমা হবে তার কোনো ভিত্তি থাকা জরুরি। প্রশ্ন হয়, যখন কুরআন এবং হাদিস বিদ্যমান তখন ইজমার প্রয়োজন কী? ইজমার প্রয়োজন এই জন্য যে, কোনো কোনো সময় আয়াত এবং হাদিস স্পষ্ট হয় না। ইশারা বা ইঙ্গিতের আশ্রয় নেওয়া হয়। যখন এর উপর ইজমা হয়ে যায় তখন তা অকাট্য হয়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে যাননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জায়নামাযে তার জীবদ্দশায় চৌদ্দ দিন হযরত আবুবকর রা. কে নামায পড়াতে দিয়েছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল হল এবং সাকিফায়ে বনি সায়িদায় মিটিং হল তখন আনাসার সাহাবীগণ বললেন,

مِنَّا أَمِيْرٌ وَ مِنْكُمْ أَمِيْرٌ

> আমাদের থেকে একজন আমির আর তোমাদের থেকে একজন আমির।

হযরত উমর ফারুক রা. বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় নিজ জায়নামাযে ইমামতে সুগরা তথা নামাযের ইমামতির জন্য হযরত আবুবকর রা. কে দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং ইমামতে কুবরা তথা রাষ্ট্রপরিচালনা কি তার প্রাপ্য নয়? কথাটি সকলেই বুঝতে পারল। আর সাথে সাথে مِنَّا أَمِيْرٌ وَ مِنْكُمْ أَمِيْرٌ এর দাবির বিষয়টি শেষ হয়ে গেল। সকলেই হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। ইসলামে সর্বপ্রথম ইজমা এটিই সংঘটিত হল। লক্ষ্য করুন, শুধু ইঙ্গিত ছিল নামাযের মধ্যে ইমামতি ও স্থলাভিষিক্ত করা। এবং এখান থেকে খলিফা এবং আমিরুল মুমিনীন নির্ধারণ করার বিষয়টি গ্রহণ করাটাই ইসতেদলাল (প্রমাণ পেশকরণ) ও কিয়াস। হাদিসে এদিকেই ইশারা আছে। প্রকাশ্যরূপে নয়। যাই হোক, সকল সাহাবী হযরত আবুবকর রা. এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তাই এ বিষয়টি ইজমায়ী মাসআলা হয়ে গেল। এখন যদি কেউ সিদ্দিকে আকবর রা. এর ইমামতি অস্বীকার করে তা হলে সে গোমরাহ।

মোটকথা কোনো ইজমা সনদ ব্যতীত হয় না। সুতরাং সকল ইজমা হাদিসের দিকে ফিরে গেছে। অথবা কুরআনের কোনো একটি ইশারার উপর ইজমা হয়ে থাকে। অতএব প্রত্যেক ইজমা সে দিকেই ফিরে গেছে।

কিয়াসের সম্পর্ক তিন মূলনীতির সাথেই

আমি একটু আগেই আপনাদের বলেছি, কিয়াস দ্বারা ডেগচি থেকে খাবার অর্থাৎ মাসআলা বের করা হয়। এজন্য কিয়াস সেই দিকেই ফিরে গেছে। সুতরাং চার আর চার থাকেনি এক হয়ে গেছে। ওই এক হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি শারে বা শরীয়তপ্রণেতা। তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন। সেটিই মূল। তা বিস্তৃত হতে হতে চারে পরিণত হয়েছে।

আমি আমার আলোচনায় চারটি বিষয়েরই হুজ্জিয়্যত প্রমাণ করেছি। আল্লাহ পাকের কালাম কুরআনুল কারিম তো হুজ্জত বা দলিল। আর যখন হাদিস শরিফও সে দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল, তা হলে হাদিস কেন শরীয়তের দলিল হবে না? আর ইজমার ভিত্তি যখন কোনো নসের উপর হবে, তা হলে ইজমা কেন হুজ্জত হবে না? আর ইজমা হল ওই তিন

ডেগচি থেকে মাসআলা বের করার মাধ্যম। তা হলে কিয়াস কেন দলিল হবে না? চারটি বিষয়েরই হুজ্জিয়্যত প্রমাণিত হল।

আমি যেসব আয়াত তিলাওয়াত করেছি এখন তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করবো। সুরা নিসার আয়াতের অনুবাদ।

আর ওইব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তার জন্য হিদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। অর্থাৎ কুরআন নাযিল হয়ে গেল। ওই ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তার কিতাবের উপর ঈমান আনলো। এরপর সে রাসূলের উপর ঈমান আনলো। কারণ তার মাধ্যমেই এই কুরআন তার কাছে পৌঁছেছে। যখন সে রিসালাতে মুহাম্মদীকে মেনে নিল তখন তার বুঝা উচিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি আল্লাহর প্রেরিত। তিনি যে কথাবার্তা মানুষকে শুনিয়ে থাকেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই শুনিয়ে থাকেন। অতঃপর সে যদি এই কথা বলে যে, হাদিস শরিফে যে আছে তা হুজ্জত নয়। তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মানার অর্থ কী?

যদি কেউ স্বীকার করে যে, এই লোক বাদশার পক্ষ থেকে প্রেরিত, সে বাদশার সংবাদ বা খবরবার্তা পৌঁছায়। কিন্তু সংবাদ প্রদানকারী ব্যক্তি এই খবরের যে ব্যাখ্যা করে তা লোকটা মানে না। তা হলে অমান্যকারীকে বলা হবে, হে লোকসকল, তুমি বাদশার বার্তাবাহককে মানছ কিন্তু বার্তাবাহক সংবাদের যে ব্যাখ্যা করছেন তা মানছ না; অথচ বার্তাবাহক স্বয়ং বাদশার পক্ষ থেকেই সংবাদের ব্যাখ্যা নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা বলছেন না। তা হলে এ অমান্য করাটা বিবেক-বুদ্ধিহীন কাজ নয় কি? এমনিভাবে কুরআন আল্লাহর কিতাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। কাজেই উভয় বিষয়কেই মানতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা সে মানল না। তা হলে এমন ব্যক্তি যেন নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে। ইরশাদ হয়েছে,

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলছে। ইজমায়ে উম্মত নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। সকল উম্মত ঐকমত্য হয়ে যেই রাস্তায় চলছে সে ওই রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা গ্রহণ করেছে। তাই এ দুটি বিষয়ের উপর এ কথা বলেছেন,

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى

সে যে দিকে যেতে চায় আমি যেতে দেব।

وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

পরিশেষে আসবে তো আমার কাছেই। তখন তাকে জাহান্নামে পৌছে দেব।

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

আর দোযখ অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা।

উক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা হুজ্জিয়্যতে হাদিস সাব্যস্ত হয়। আবার ইজমায়ে উম্মতও সাব্যস্ত হয়। সর্বপ্রথম এই আয়াতে কারিমা দ্বারা ইজমায়ে উম্মত দলিল হওয়ার উপর আমাদের সরদার ইমাম শাফেয়ী রহ. তার প্রসিদ্ধ কিতাব اَلرِّسَالَةُ এর মাঝে প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং হাদিস এবং ইজমা উভয়টি হুজ্জত হওয়া কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেল।

এখন সুরা নাহলের দ্বিতীয় আয়াতটি ধরুন। আল্লাহ তায়ালা একটি প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মক্কার মুশরিকরা বলত, যদি আল্লাহর মানুষের কাছে পয়গাম প্রেরণ করার প্রয়োজনই হতো তা হলে তো আল্লাহর কাছে ফেরেশতার কোনো কমতি ছিল না। তিনি কোনো ফেরেশতা দ্বারা পয়গাম পৌঁছাতে পারতেন। একজন মানুষ, যে আমাদের মতো খায়, পান করে, বাজারে যায়, চলাফেরা করে, তাকে কেন রাসূল

বানিয়ে পাঠালেন? সুরা নাহলে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদী-নাসারাদের জিজ্ঞেস কর, অতীতকালে যখন রাসূল এসেছে তখন কে এসেছে? সর্বদা পুরুষকেই রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। মানুষই রাসূল হয়ে এসেছে। নারী এবং ফেরেশতাদের কখনও রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়নি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহর এই নীতিই চালু আছে। এখন তোমরা এ কেমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছ যে, মানুষকে রাসূল বানিয়ে কেন প্রেরণ করা হল? ফেরেশতাকে কেন পাঠানো হল না? আল্লাহর নীতি হল ফেরেশতাকে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠানোর যথার্থতা বর্ণনা করেছেন। কথা অনেক দীর্ঘ। আমি আলোচনা বিস্তৃত করব না। অনুবাদ মন দিয়ে শুনে নিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

মানুষকে মানুষের কাছে রাসূল বানিয়ে এই জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে, তিনি লোকদের আল্লাহর পয়গাম সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। মাঠে-ময়দানে যেমন বৃষ্টি হয় তেমনিভাবে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে কুরআন এসে যেত তা হলে এই কুরআন কে বুঝিয়ে দিত? এই জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কুরআন লোকদের কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কুরআনকে আপনার মাধ্যমে লোকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। যেন আপনি লোকদের কাছে পৌঁছে দেন এবং বুঝিয়েও দেন।

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

আপনি লোকদের খুলে খুলে বুঝিয়ে দেন, এই কুরআন যাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।

ফেরেশতার মাধ্যমে পৌছানো হলে তারা খুলে খুলে সুন্দরভাবে বুঝাতে পারতেন না। মানুষ মানুষের চাহিদাসমূহের ব্যাপারে অবগত। তাদের অবস্থাসমূহের ব্যাপারে অবগত। মানুষ এই অবস্থাগুলো বুঝে কুরআনের স্পষ্ট

ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। ফেরেশতা আমাদের অবস্থা জানে না। তাদের ক্ষুধা হয় না। পিপাসাও লাগে না। তা হলে তারা আমাদের জন্য রোযার মাসআলা কীভাবে বর্ণনা করবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন উত্তমরূপে বুঝিয়েছেন। আর এর নামই হল হাদিস। সুতরাং কুরআন যদি নিশ্চিত রূপে হুজ্জত হয়, তবে হাদিসও হুজ্জত। কেননা আল্লাহ কুরআন সুস্পষ্ট করার জন্য রাসূলকে মাধ্যম বানিয়েছেন। সুতরাং সেই কুরআনের যেই ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তাও হুজ্জত। এরপর বলেছেন,

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

সম্ভবত তারা চিন্তা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন উত্তমরূপে বুঝাবেন। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত সকল অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝাবেন না। যথাসময়ে সকল অবস্থা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে কে ভালোভাবে বোঝবে? এই কথাগুলো সংরক্ষণই-বা কীভাবে করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় যেসকল প্রয়োজন ছিল, সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সাহাবায়েকেরাম সেগুলো শুনেছেন এবং বুঝেছেন। অতঃপর সাহাবীগণের যুগে যেসকল প্রয়োজন সামনে এসেছে, সেই প্রয়োজনগুলোর আহকাম সাহাবীগণ কুরআন এবং হাদিসে চিন্তা ও গবেষণা করে বের করেছেন। কিন্তু সাহাবাগণ তাদের যমানার অবস্থার হুকুম-আহকাম বের করবেন। এমনিভাবে প্রত্যেক যমানার প্রয়োজন সেই যমানার ফকীহগণ কুরআন এবং হাদিসের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করে পূর্ণ করবেন। আজ পনেরতম শতাব্দী। এই শতাব্দীতে বিভিন্ন মাসায়েল সামনে আসছে। যেমন ক্লোন এর কী হুকুম? বেবি টিউবের কী হুকুম? চাঁদের দেশে মানুষ গিয়েছে, তখন রাস্তায় কীভাবে নামায আদায় করবে? এই সকল মাসআলা একালের মুফতি বর্ণনা করবে। কোথা থেকে বর্ণনা করবে? এই কুরআন, হাদিস, সাহাবীদের আকওয়াল (ফতোয়া) এবং ফিকহের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেই বর্ণনা

করবে। এরই নাম কিয়াস। সুতরাং আয়াতের এই শেষ অংশ দিয়ে কিয়াসও হুজ্জত সাব্যস্ত হল।

আর কিয়াস ব্যতীত কোনো উপায়ই নেই। গায়রে মুকাল্লিদরা আমাদের চেয়েও অধিক কিয়াস করে থাকে। কিন্তু বাবুল কিয়াস পড়ে না। পড়া ব্যতীতই তারা কিয়াস করে। চোখ বন্ধ করে মাটি দ্বারা চামচ পূর্ণ করে মাটি তুলে নিয়ে আসে। তাদের ফিকহের কিতাবগুলো পড়ে দেখ। আশ্চর্য যতসব ইসতেমবাত সামনে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এবং অন্যান্য সকল গোমরাহ ফিরকাকে সঠিক রাস্তায় ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আখিরাতের খারাপ পরিণতি থেকে হিফাযত করুন। আলোচ্য বিষয়ের আরো অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। সময়ের স্বল্পতা বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই এখানেই সমাপ্ত করলাম।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

গোমরাহীর বড় কারণ
গোমরাহ লোকদের অনুসরণ

(মাদ্রাজ ইজতেমায় প্রদত্ত অন্য একটি বয়ান)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَ نُؤْمِنُ بِه وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه، أَرْسَلَه إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَ دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِه وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِه وَ صَحْبِه وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، وَ بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ و الْأَنْصَارِ و الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ و رَضُوْا عَنْهُ و أَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارخَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (صَدَقَ اللّٰه العظيم)

আজকের আলোচ্য বিষয় 'তাকলিদ পরিত্যাগ করা গোমরাহীর বড় কারণ'। আমি শিরোনামে সামান্য পরিবর্তন করেছি। কেননা তাকলিদ ব্যতীত যিন্দেগীর গাড়ি এক কদমও চলতে পারে না বরং 'গোমরাহীর বড় কারণ গোমরাহ লোকদের অনুসরণ'। আমি এই বিষয়ের উপরই আলোচনা করব।

তাকলিদের অর্থের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি

সর্বপ্রথম একটি মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি, যা তাকলিদের মাসআলার ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করা জরুরি। লোকদের অন্তরে একথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাকলিদের উদ্দেশ্য হল নিজের গলায় রশি বেঁধে নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। যেন সে যেখানে চায় নিয়ে যেতে পারে। যদি চায় জান্নাতে পৌঁছে দিবে তবে জান্নাতে যাও। আর যদি জাহান্নামে পৌঁছে দেয় তবে জাহান্নামে যাও। এই ভুল বিষয়টি মানুষের অন্তরে এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, মানুষ তা বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আমরা এতো বোকা এবং আহাম্মক কেন হতে যাব? আমরা কি এতো বোকা জানোয়ার হয়ে গেলাম যে, গলায় রশি বেঁধে নিজেদের অন্যের হাতে তুলে দেব?

তাকলিদের সঠিক ব্যাখ্যা

তাকলিদের সঠিক ব্যাখ্যা কী তা ভালোভাবে বুঝে নিন। এখানে আলেমদের বড় একটি জামাত উপস্থিত। তারা যেন এই মাসআলাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়। تَقْلِيْدٌ শব্দটি بَاب تَفْعِيْل এর মাসদার। শব্দটি قَلَّدَ قِلَادَةٌ থেকে নির্গত। قِلَادَةٌ শব্দের অর্থ হল মালা, হার। تَقْلِيْدٌ (তাকলিদ) শব্দের অর্থ কাউকে মালা বা হার পরানো। ফিকহের কিতাবে এই শব্দ ব্যবহার হয়েছে قَلَّدَ الْقَاضِى তথা বাদশা কাউকে হাকিম বা কাজী বানিয়ে দিল। অর্থাৎ কাউকে কাজীর (বিচারকার্যের) দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সুতরাং তাকলিদের অর্থ হল কাউকে বিশ্বস্ত অনুসৃত হওয়ার মালা পরানো। আর দীনের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা।

আর যে ভুল অর্থটি মানুষের অন্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই অর্থের জন্য بَاب تَفَعُّلْ থেকে تَقَلَّدَ সিগাহ্ আসবে। بَاب تفعِيْل থেকে تَقْلِيْدٌ আসবে না। تَقَلَّدَ এর অর্থ হল নিজের গলায় রশি বাঁধা। কিন্তু تَقْلِيْدٌ অর্থ তা নয়। তাকলিদকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নিন। আজকের একটি ফ্লাইটে তিনটি দলের দলনেতা আসবে। একজন কংগ্রেসের আরেকজন বিজিপির ও অপরজন ডিএমকের[১১] নেতা।

১১. ডিএমকে মাদ্রাজের একটি স্থানীয় রাজনৈতিক দল।

সকল দলের কর্মীরাই ফুলের মালা নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌছে গেল। ফ্লাইট অবতরণ করলো। এক পার্টির নেতা বের হয়ে এলো। কংগ্রেসের নেতা বেরিয়ে এলেন। ওই পার্টির লোকেরা মিছিল করতে লাগলো- জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। অতঃপর নেতা এগিয়ে এলো। প্রত্যেকেই তাকে মালা পরাতে লাগলো। মালা পরে যখন তিনি চলতে শুরু করলেন তখন সকলেই তার পিছনে চলতে লাগলেন। এটিই হল তাকলিদ। এটিই হল ইত্তেবা বা অনুসরণ। অর্থাৎ প্রথমে তাকে বিশ্বস্ততার মালা পরালো। এরপর যখন তিনি চলতে লাগলেন, তখন তার পিছনে তারাও চলতে লাগলো। অন্যান্য বহুলোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর বিজিপির নেতা এলেন। তখন ওই পার্টির নেতা-কর্মীরা খুশিতে ফুলে-ফেঁপে উঠল এবং জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ শ্লোগান দেওয়া শুরু করল। অতঃপর পার্টির সকল লোকই তাকে বিশ্বস্ততার মালা পরাল। আর যখন তিনি চলতে লাগলেন তখন তার পিছনে পিছনে তারাও চলতে লাগলো। এটিই হল তার তাকলিদ বা অনুসরণ। এরপর যখন ডিএমকের দলনেতা আসবে তখন তার পার্টির লোকেরা খুশিতে আত্মহারা হবে। মিছিলের মাধ্যমে স্বাগতম জানাবে। অতঃপর তাকে বিশ্বস্ত হওয়ার মালা পরাবে। আবার যখন তিনি চলতে থাকবেন তখন তারাও তার পিছনে চলতে থাকবে। এটিই তাকলিদ বা ইত্তেবা।

এটি হল একটি উদাহরণ। একে ভালোভাবে বুঝে নিন। তাকলিদের জন্য দুটি জিনিস জরুরি। প্রথমত হল বিশ্বস্ত হওয়ার মালা পরাতে হবে। দ্বিতীয়ত তার পিছনে পিছনে চলতে হবে। এ দুটি একত্র হলেই তবে তাকলিদ হবে অন্যথায় হবে না। যদি মালা পরায় কিন্তু পিছে না চলে অথবা মালা পরায়নি (অর্থাৎ তার প্রতি বিশ্বাস বা ভক্তি নেই) শুধু পিছনে পিছনে চললো। তা হলে এমন কাজও তাকলিদ হবে না।

এমনিভাবে এই উম্মতের মধ্যে অনেক অনেক মহাপুরুষ অতীত হয়েছেন। শুধু চার ইমামই মহান ব্যক্তিত্ব, বিষয়টি এমন নয়। আর দীন বুঝার ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল মানুষ কার কথা শোনবে এবং কাকে মানবে? উত্তর হল, আপনি যার প্রতি বিশ্বাসী তাকে বিশ্বস্ততার মালা পরিয়ে দিবেন এবং তার পিছনে চলবেন। তার অনুসরণ করবেন।

তিনি কুরআন ও হাদিসের যে অর্থ বলবেন সে অনুযায়ী আমল করবেন। এর নামই হল বিশ্বস্ততা। এর নামই অনুসরণ। এটিই তাকলিদের আসল ও অন্তর্নিহিত মর্ম।

তাকলিদ এবং ইত্তেবা একই জিনিস

যদি আপনি তাকলিদের এই সঠিক তাৎপর্য বুঝে থাকেন তবে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় আর মাথা থেকে বোঝা সরে যায়। তাকলিদ এবং ইত্তেবা একই জিনিস। যমানার পরিবর্তনে পরিভাষা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পরিভাষা পরিবর্তনের কারণে হাকিকত (বাস্তব অবস্থার) পরিবর্তন হয় না। দেখুন, বর্তমানে যে জিনিসকে তাসাউফ বলা হয় এটি তৃতীয় যুগের পরিভাষা। এই তাসাউফকে প্রথমে 'যুহদ' বলা হত। আর এই 'যুহদ'কে হাদিস শরিফে ইহসান বলা হয়েছে। সর্বপ্রথম হাদিসে ইহসান শব্দ অতঃপর কুরআনে মুহসিনীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজিদের যেখানে মুহসিনীন এবং হাদিসে জিবরাইলে যে ইহসান শব্দ এসেছে এবং এর যে উত্তর এসেছে তথা أَنْ تَعْبُدَ اللهَ... তাই হল তাসাওউফ। এরপর যমানা সামনে এগিয়ে গেছে। হাদিস সংকলনের যুগ এসেছে। হাদিস সংকলনের কাজটি ক্রমান্বয়ে ২৫০ বছর পর পূর্ণতা লাভ করেছে। যত বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন তাদের সকলেরই তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পঞ্চাশ-এর মধ্যে অথবা তার পরে ইনতেকাল হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ইনতেকাল ২৪১ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম দারেমী রহ. এর ইনতেকাল ২৫৫ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. এর ইনতেকাল ২৫৬ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. এর ইনতেকাল ২৬১ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর ইনতেকাল ২৭৩ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রহ. এর ইনতেকাল ২৭৫ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. এর ইনতেকাল ২৭৯ হিজরীতে হয়েছে। ইমাম নাসায়ী রহ. এর ইনতেকাল ৩৩০ হিজরীতে এবং ইমাম তাহাবী রহ. এর ইনতেকাল ৩২১ হিজরীতে হয়েছে।

২৫০ বছর অতীত হতেই ইহসান এবং মুহসিনীনের জন্য নতুন শব্দ ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায়। হাদিসের যেসকল কিতাব লেখা হয়েছে সেগুলোতে أَبْوَابُ الزُّهْدِ এসেছে। হাদিসের কিতাবাদিতে أَبْوَابُ الْإِحْسَانِ নেই। أَبْوَابُ الْمُحْسِنِيْنَ-ও নেই। আবওয়াবুয-যুহ্দে যেসকল রিওয়ায়েত এসেছে সেগুলোই তাসাওউফের রিওয়ায়েত। এরপর চারশত বছর অতীত হয়ে পঞ্চম শতাব্দী শুরু হয়। তখন আল্লাহর বহু বান্দা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। দুনিয়ায় থেকে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহবিমুখ ছিলেন। গোটা পৃথিবী উন্নত জামা-কাপড় পরিধান করত। কিন্তু এই আল্লাহর বান্দাগণ পশমের কাপড় পরিধান করতেন, যা ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের কাপড়। আর পশমকে আরবিতে বলা হয় صُوْف। তখন সুফী শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হল। অর্থাৎ পশমের কাপড় পরিধানকারী লোক। এখন এই ইলমকে তাসাওউফশাস্ত্র বলা শুরু হল। আর যেব্যক্তি এই পথের পথিক হত তাকে বলা হত সুফী।

মোটকথা তিন যমানায় তিনটি পরিভাষার ব্যবহার। কুরআন-হাদিসে ইহসান এবং মুহসিনীন শব্দ এসেছে। ২৫০ বছর পর যুহদ এবং যাহেদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অতঃপর ৪০০ বছর পর তাসাউফ এবং সুফী শব্দের ব্যবহার চালু হয়েছে। শব্দাবলি পাল্টাতে থাকে কিন্তু হাকিকত একই থাকে।

এই বিষয়টি যদি আপনি বুঝে থাকেন তা হলে এবার বুঝুন, প্রথমে ইত্তেবা শব্দ ব্যবহার হত। কুরআন মজিদে ইত্তেবা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিস শরিফেও ইত্তেবা শব্দের ব্যবহার রয়েছে। অতঃপর একটি দীর্ঘ সময় অতীত হওয়ার পর এই শব্দ পরিবর্তন হয়ে তাকলিদ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ইত্তেবা এবং তাকলিদ মূলত একই জিনিস।

আমি বলেছি যমানার পরিবর্তনের কারণে পরিভাষা বদলায়। এখন যদি কেউ বলে, এগুলো কুরআন ও হাদিস থেকে দেখাও? এটি তো পরের উৎপাদিত শস্য। দেখুন, ফুকাহায়েকেরামের যমানা যখন এসেছে, তখন

বহু পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, মুসতাহাব, মাকরুহে তানযিহী, মাকরুহে তাহরিমী এবং হারাম ইত্যাদি। এখন যদি কেউ বলে, জুমার দিন গোসল করা সুন্নত। কুরআন এবং হাদিস থেকে সুন্নত শব্দ দেখাও। তা হলে কোথা থেকে দেখাবে? এই সকল পরিভাষা ফকীহদের যুগে শুরু হয়েছে। সুন্নতের যে সংজ্ঞা, তা আমরা আপনাকে হাদিস থেকে দেখাতে পারব। অর্থাৎ সুন্নত কোনপর্যায়ের হুকুম হয় তা হাদিস থেকে দেখানো যাবে। কিন্তু সুন্নত শব্দ কোথা থেকে দেখাব! এমনিভাবে তাসাওউফ তৃতীয় শতাব্দীর উৎপাদিত ফসল। কিছু মানুষ তাসাওউফকে অস্বীকার করে। তারা বলে, কুরআন এবং হাদিসে তাসাওউফ এবং সুফী শব্দ দেখাও? তখন কোথা থেকে দেখানো হবে? এগুলো তো পরে উৎপন্ন ফসল। হিন্দুস্তানের বড় মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'য় যখন তাসাওউফের আলোচনা করেছেন তখন শিরোনাম দিয়েছেন أَبْوَابُ الْإِحْسَانِ কেননা কিছুলোক তাসাওউফ মানে না। এই কারণেই শাহ সাহেব রহ. তাসাওউফ শব্দ ছেড়ে কুরআন এবং হাদিসের শব্দ ও পরিভাষা ইহসান শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেন কেউ অস্বীকার করতে না পারে।[১২]

আপনাদের এই শহরের বড় এক ব্যক্তিত্ব, হযরত মাওলানা বখতিয়ারী রহ.। তিনি প্রথম দিকে মওদুদী জামাতে শামিল ছিলেন। যখন মওদুদীর গোমরাহী স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন (মওদুদী সাহেব তাসাওউফকে 'চিনাবেগম' বলে। চিনাবেগম বলা হয় আফিমকে।

---

১২. এখানে একটি বিষয় মনে পড়ে গেল, তাবলিগ জামাতের ব্যাপারে লোকেরা সৌদি আরবের বড় শায়েখ ইবনে বায রহ. এর কান ভারি করল। একসময় মক্কার হেরেমে তাবলিগের মুরুব্বিদের সাথে তার কথা হল। ইবনে বায বললেন, আপনারা বায়আত গ্রহণ করেন? মাওলানা উমর পালনপুরী রহ. উত্তর দিলেন, শায়েখ আমরা বায়আত গ্রহণ করি না। আমরা লোকদের থেকে আহদ (অঙ্গীকার) গ্রহণ করি। এই এই কাজ করবেন এবং এই এই কাজ করবেন না (এই কথার উপর)। এ কথা শুনে শায়েখ বললেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। অথচ বায়আত এবং আহদ একই জিনিস। এই ঘটনাই ঘটেছে এহসান ও তাসাওউফের ব্যাপারে।

তার নিকট তাসাওউফ হল আফিম)। তিনি একটি মহকুমা (দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম রাখেন معہد احسانی মা'হাদে ইহসানী। কেননা তাসাওউফ শব্দের কারণে মানুষের এলার্জি হয়। এজন্য তিনি এই শব্দ ছেড়ে কুরআন এবং হাদিসের শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরিভাষা পরিবর্তনের কারণে হাকিকত পরিবর্তন হয় না।

তাকলিদ করা ওয়াজিব

তাকলিদের দলিল কুরআনুল কারিমে উল্লেখ আছে। এমন স্পষ্ট আয়াত যেমন দুপুরের সূর্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

والسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ

সবার চেয়ে অগ্রগামী মুহাজিরদের মধ্য থেকে এবং আনসারদের মধ্য থেকে। সাহাবীদের দুটি ভাগ ছিল। মুহাজির এবং আনসার। মুহাজিরদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন এবং ইলমে দীন অর্জন করার দিক থেকে অগ্রগামী আর আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

আর ওই সকল লোক, যারা সাবিকিনে আওয়ালিন তথা মুহাজির এবং আনসারদের অনুসরণ করে; নেক কাজের ক্ষেত্রে ইখলাসের সাথে। দীনের ক্ষেত্রে যেসকল লোক মুহাজির এবং আনসারদের থেকে সাবিকিনে আওয়ালিনের ইত্তেবা ও অনুসারণ করে।

এই মুহাজির এবং আনসারদের অনুসরণকারী লোক কারা? যেমন রেলগাড়ির অনেকগুলো বগি থাকে। ইনজিনের সাথে প্রথম একটি বগি যুক্ত হয়। তার সাথে দ্বিতীয়টি। দ্বিতীয়টির সাথে তৃতীয়টি। তৃতীয়টির সাথে চতুর্থটি মিলিত হয়। যদি রেলের পঁচিশটি বগি থাকে তা হলে সবগুলো ইনজিনের সাথে একত্রে মিলিত থাকে না; বরং ইনজিনের সাথে শুধু একটি বগিই লেগে থাকে। এরপর তার সাথে দ্বিতীয়টি। তার সাথে তৃতীয়টি লেগে যায়। এমনিভাবে উম্মতের একটি শিকল আছে। একটি ধারাবাহিকতা আছে। তার ইনজিন হল,

والسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ و الْاَنْصَارِ

তথা মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে অগ্রবর্তী লোকজন। তাদের সাথে ছোট সাহাবীর বগি যুক্ত হয়েছে। অতঃপর যখন সাবিকিনে আওয়ালিন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তখন ছোট সাহাবী বড় সাহাবীতে পরিগণিত হয়েছেন। আর তিনিই ইনজিন (পথনির্দেশক) হয়ে গেছেন। তার সাথে তাবেয়ীদের বগি যুক্ত হয়েছে। অতঃপর যখন সেই সাহাবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তখন তাবেয়ী ইনজিন হয়ে গেছেন। আর তার সাথে তাবে তাবেয়ীদের বগি যুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে একটি ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট। ইরশাদ হয়েছে,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْه

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

এই দুইপ্রকার লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। এমন জান্নাত (বাগান), যার তলদেশে নদী প্রবহমান। এই লোকেরা সেই জান্নাতে চিরদিন থাকবে।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْم

এটিই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।

যদি কেউ কুরআন থেকে বুঝতে চায় তবে তাকলিদ সাব্যস্ত করার জন্য এরচেয়ে অধিক স্পষ্ট আয়াত কুরআনুল কারিমে নাই। আর যদি কেউ বুঝতেই না চায় তা হলে কত হাজার কথা বের করতে সক্ষম হবে। তার কোনো ইয়ত্তা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ,

مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

যাকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ করেন, কেউ তাকে সঠিক রাস্তায় আনতে পারে না।

লোকজন আমাকে প্রায়ই বলে থাকে, আমরা এই মজলিসে অমুককে ডেকে নিয়ে আসি, তাকে একটু বুঝিয়ে দিন।[১৩]

তখন আমি বলি, ডেকে আনার প্রয়োজন নেই।

مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে? সেই বিষয়টি লক্ষ্য করুন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

হ্যাঁ, যদি এর জন্য তার অল্প সময় ফিকির পয়দা হয় সে নিজে নিজে চিন্তা করে এবং আল্লাহর কাছে হিদায়েত চায় তা হলে আল্লাহ তায়ালা হিদায়েত দিবেন। অন্যকেউ বুঝিয়ে দেওয়ায় তা সম্ভব নয়। সুতরাং যদি কেউ বুঝতে চায় তবে এরচেয়ে স্পষ্ট কোনো আয়াত নেই।

ইহসানের অর্থ

বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْاهُمْ بِاِحْسَانٍ

ইহসান অর্থ কী? আমি বলেছিলাম, তাসাওউফের জন্য যে ইহসান শব্দটি হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে, কুরআনে হুবহু সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কুরআনে তার জন্যই মুহসিনীন শব্দ এসেছে। ওখানে যে ইহসান শব্দ এসেছে তার অর্থ হল ইখলাসের সাথে, বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে, সঠিক উদ্দেশ্যে। বিষয়টি বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

---

১৩. এক ব্যক্তি মাদ্রাজে বড় ধরনের ফিতনা ছড়াচ্ছিল। আমার জানা নেই, সে আহলে কুরআন ছিল নাকি আহলে হাদিস ছিল। অথবা ভিন্ন কোন ফিতনা সৃষ্টিকারী। তার ফিতনার দরজা বন্ধ করার জন্য শহরের উলামায়ে কেরাম ও শহরের নেতৃবৃন্দ দুদিনের জন্য ছাউনি ফেলেছিলেন। যাতে তামিল নাড়ু প্রদেশের কম থেকে কম এক হাজার আলেম উলামা শরীক ছিলেন এবং হাজার হাজার জনতা সমাবেশ হয়েছিল। সেই মজলিসে এই বয়ানগুলো করেছেন।

এক হানাফীর শাফেয়ী সেজে নামায আদায় করা

একটি মহল্লার সকলেই শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বনকারী। তারা তাদের মহল্লায় যে ইমাম নিয়োগ দিয়েছেন, তিনি হানাফী মাযহাব অনুসারী। মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই চায় হানাফী ইমাম শাফেয়ী সেজে নামায পড়াক (কিছুলোক মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল এজন্য শোনাচ্ছি)। যখন চার মাযহাবই সত্য, তখন এই কথা বলাটা তাদের ভুল ছিল যে, হানাফী হয়ে নামায পড়াও। শাফেয়ী হয়ে নামায পড়াও। মালেকী হয়ে নামায পড়াও। এর অর্থ তাদের অন্তরে সংশয় আছে। চার মাযহাবই সত্য এ কথা তাদের অন্তর গ্রহণ করছে না। যদি প্রকৃতই তাদের অন্তর এ কথা গ্রহণ করে থাকে তা হলে ইমাম সাহেব হানাফী হোক আর মুকতাদী শাফেয়ী হোক অথবা এর উল্টা হোক, তাতে কী এসে যায়? হাদিসে একটি ঘটনা এসেছে। এক তাবেয়ী এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি চামড়ার মোজা পরিধান করি। যদি আমি পাঁচওয়াক্ত নামাযেই মোজা খুলে পা নতুন করে ধুই। এর ফলে কী অসুবিধা হবে? সাহাবী বললেন, অনেক বড় অসুবিধা। পাঁচওয়াক্ত নামাযেই আপনি মোজা খুলবেন কেন? মোজা মাসাহ করার ব্যাপারে আপনার অন্তরে সংশয় আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আহকামের ব্যাপারে আপনার অন্তর প্রফুল্ল না হবে, আপনার জন্য এমন করা ঠিক হবে না।[১৪]

সুতরাং যখন চার মাযহাবই সত্য, তখন মুকতাদিদের এমনটি বলা ও কামনা করা ভুল। হ্যাঁ, আমরা একই রকম চাই। আমাদের একই রকম চাওয়া মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। যদি আমরা একই রকম চাই তবে তাও ঠিক আছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যখন মহল্লাবাসী শাফেয়ী তখন শাফেয়ী ইমাম নিয়ে আসুন। হানাফী ইমাম কেন নিয়োগ দিবেন? কিন্তু যখন হানাফী ইমাম নিয়োগ দিয়েছেন, তখন তাকে শাফেয়ী সেজে নামায পড়াতে বলা ঠিক নয়। ইমাম যদি এমন করে থাকে তখন সে শাফেয়ী রহ. এর ইত্তেবা ইখলাসের সাথে করেনি। চাকরির জন্য করেছে। জাগতিক আয়-রোজগারের জন্য করেছে। সুতরাং ইমামের জন্য এমন করা জায়েয নয়। আর তিনি এই আয়াতের (মিসদাক) কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিও না।

---

১৪. তিরমিযী

সুতরাং একজন হানাফী আলেম, যার ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলাদির উপর আস্থা এসে গেছে তবে সে পরিপূর্ণভাবে শাফেয়ী হয়ে যাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। এমনিভাবে একজন শাফেয়ী আলেম, যার ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিলাদির উপর আস্থা এসে গেছে। সে পরিপূর্ণভাবে হানাফী হয়ে যাবে। তখন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো হানাফীর জন্য জায়েয নেই, সে শাফেয়ী হয়ে নামায পড়াতে থাকবে। অথচ সে হানাফী। এমন লোক, وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এর দ্বারা আপনারা ইহসান অর্থ বুঝতে পারেন। কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ভ্রান্ত নিয়তে পূর্ববর্তীদের ইত্তেবা করা যাবে না; বরং তাদের ইত্তেবা ও অনুসরণ হতে হবে বিশুদ্ধ দীনের উপর আমল করার জন্য। এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট। আর তাদের জন্যই তিনি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন।

প্রমাণপঞ্জির উপর প্রশ্ন ও তার উত্তর

উল্লিখিত আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আমি তাকলিদ প্রমাণ করেছি। কারো মনে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এটি তো সুরা তাওবার আয়াত। আর সুরা তাওবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গাযওয়ায়ে তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) কথা আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হল মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য থেকে যেসকল বড় বড় সাহাবী তাবুক যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন এবং অন্যান্য যেসকল সাহাবা তাদের পিছনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। দীনের ক্ষেত্রে পিছনে চলার মাসআলা এই আয়াতে নেই।

এমনি আরেকটি আয়াতের ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদ এবং মওদুদী সাহেবরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। আয়াতটি হল,

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

অত্যন্ত পবিত্র বান্দা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। সম্মানিত এ আয়াত দ্বারা চারজন ইমাম একটি মাসআলা বের করেছেন, কুরআনুল

কারিম অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না। আপনি অযু ছাড়া তিলাওয়াত করতে পারবেন। কিন্তু অযু ছাড়া কুরআনুল কারিমে হাত লাগাতে পারবেন না। এটা আপনার জন্য জায়েয নয়।

মওদুদীপন্থী এবং গায়রে মুকাল্লিদরা বলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, কুরআন করীম লওহে মাহফুযে আছে। আর লওহে মাহফুয এমন স্থান, যেখানে শুধু ফেরেশতারাই পৌঁছতে পারে। শয়তান সেখানে পৌঁছতে পারে না। শয়তান সেখানে পৌঁছে কুরআনুল কারিমে অরাজকতা করবে, এমনটি সম্ভব নয়। অযু ছাড়া কুরআনে হাত লাগানো জায়েয নেই। এই মাসআলাটি ইমামগণ কুরআন থেকে খুব গুরুত্বের সাথে উদ্ভাবন করেছেন। মোটকথা যেমনিভাবে এসব লোক উক্ত আয়াতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, অনুরূপ আলোচিত আয়াতেও তারা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারবে।

এর উত্তর এই যে, সুরা হাশরে ইরশাদ হয়েছে,

مَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

গায়রে মুকাল্লিদ, মওদুদীপন্থী এবং আমরাও এই আয়াত দ্বারা হুজ্জিয়্যতে হাদিসের মাসআলা বের করি। অথচ এ আয়াতটি ‘মালে ফাই’য়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে (একটি হল ‘মালে গনিমত’, যা মুজাহিদগণ যুদ্ধ করে অর্জন করে। তার এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের জন্য নির্ধারিত। আর বাকি চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অপরটি হল ‘মালে ফাই’, যা সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়। সেগুলো মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন হয় না)। যখন বনু নাযিরের এলাকা বিজয় হল এবং ‘মালে ফাই’ বণ্টন শুরু হল তখনই আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদ অবতীর্ণ হল, যাকে আল্লাহর রাসূল ‘মালে ফাই’ দান করেন, নিয়ে নাও এবং যাকে না দেন সে বিরত থাক। অর্থাৎ সে চাইবে না। এখানেও প্রশ্ন জাগে, এই আয়াতের সাথে হুজ্জিয়্যতে হাদিসের কী সম্পর্ক? অথচ সবাই এই আয়াত দ্বারা মালে ফাইয়ের মাসআলাটিই সাব্যস্ত করে।

এর উত্তর হল, তাফসিরের একটি মূলনীতি আছে। তা হল,

اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ, لا لِخُصُوْصِ الْمَوْرِدِ

অর্থাৎ যদি আয়াতের শব্দাবলি আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক হয় তা হলে হুকুমটাও ব্যাপক হবে। আয়াতের শানে নুযুল যদিও কোনো বিশেষ ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে তার হুকুমটি সেই বিশেষ ব্যাপারটির ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট থাকবে না। আয়াতে مَا শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক বা আম। আর نَهَاكُمْ এবং فَانْتَهُوْا শব্দ দুটোও ব্যাপক অর্থবোধক বা আম। না দেওয়া এবং না চাওয়ার জন্য খাস শব্দ হল لَمْ يُعْطِكُمْ এবংفَلَا تُطَالِبُوْا। যখন এই খাস শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি এবং আয়াতটিও আম বা ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। তা হলে হুকুমটিও আম তথা ব্যাপক হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই আহকাম দিয়েছেন, তা আদেশসূচক হোক অথবা নিষেধবাচক, সবই এই আয়াতের অধীনে এসে যাবে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা হুজ্জিয়্যতে হাদিস সাব্যস্ত করা শুদ্ধ। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

এই আয়াতের শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থবোধক। কোনো বস্তু পর্যন্ত পৌছার জন্য بَلَغَ এবং وَصَلَ এর মতো বিশেষ বিশেষ শব্দ আছে। مَسَّ (ছোঁয়া) হল তার থেকেও ব্যাপক। এমনিভাবে ফেরেশতার জন্য আরবিভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ হল مَلَائِكٌ। কিন্তু কুরআনে এই খাস তথা বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি বরং مُطَهَّرُوْنَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ অত্যন্ত পবিত্র বান্দা। এটি ফেরেশতাও হতে পারে আবার অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকারী মুমিন বান্দাও হতে পারে। সুতরাং শব্দের ব্যাপকতায় অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকারী মুমিনও হতে পারে। সেও পবিত্র বান্দা। সেই কুরআন স্পর্শ করতে পারে। অযু ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। কেননা অযুবিহীন ব্যক্তি পবিত্র বান্দা নয়। আর এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা সাহাবীরাও বুঝেছেন। শুধু পুরুষ সাহাবীগণই নন বরং নারী সাহাবীগণও এমনটি বুঝেছেন।

একবার হযরত উমর রা. তলোয়ার নিয়ে বের হলেন অনেক বড় একটি ইচ্ছা পুরা করা জন্য। এক ব্যক্তি বলল, আগে তোমার বোন-ভগ্নিপতির খবর নাও। বোনের বাড়িতে পৌছে গেলেন। তখন তারা দুজনই হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. এর নিকট কুরআন শিক্ষা করছিলেন। হযরত উমর রা. দরজা নক করলেন। সকলেই বোঝতে পারলেন লোকটি কে। হযরত আম্মার রা. কে তারা লুকিয়ে রাখলেন এবং কুরআনুল কারিমও গোপন করা হল। অতঃপর দরজা খুলে দেওয়া হল। হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী পড়ছিলে? তারা উত্তর দিলেন, আমরা কথাবার্ত বলছিলাম। হযরত উমর রা. ভগ্নিপতিকে পিটাতে আরম্ভ করলেন। বোন তার স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাকেও এমনভাবে মারধর করলেন যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। বোনকে ভাই প্রহার করে আর বোন রক্তাক্ত হয়ে যায়। এতে অন্তরে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হযরত উমর রা. এর অন্তর বিগলিত হল। তিনি বললেন, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। বোন উত্তর দিলেন, আমরা এমন কিতাব পড়ছিলাম, যা শুধু পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু আপনি তো নাপাক। তাই আমরা এই কিতাব আপনার হাতে দিতে পারি না। হযরত উমর রা. বোনের ঘরে গোসল করলেন। তারপর তাকে সুরা তহা দেওয়া হল। সুরাটি পড়ার পর তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। মোটকথা ওই সময় হযরত ফাতেমা রা. এই আয়াত দ্বারাই দলিল পেশ করেছিলেন।

এমনিভাবে এই আয়াত যদিও তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু আয়াতটির শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। তাবুকযুদ্ধের উদ্দেশে সর্বপ্রথম কে বের হয়েছিলেন? সাহাবীগণ বের হননি। সবার আগে বের হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার সঙ্গী হয়েছিলেন সাহাবীরা কিন্তু আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখ নেই। শুধু মুহাজির এবং আনসারদের বড় বড় ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ আছে। তারপর-

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

এর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে (اتَّبَعُوْا) ইত্তেবা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিয়ামত পর্যন্ত আনুগত্যকারী সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা আয়াতের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য বিষয়, বিশেষ কোনো ঘটনা ধর্তব্য নয়। আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা যতগুলো মাসআলা বের করা যায়, তার থেকে তা বের করা হবে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা ইত্তেবা এবং তাকলিদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিও সাব্যস্ত হবে।

এরপর এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ওয়াজিব হওয়ার জন্য তো আমরের সিগাহ (আদেশসূচক শব্দ) থাকা জরুরি, যা এখানে নেই। এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, اَخْبَار সমূহ اِنْشَاء কেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। হাদিসে এসেছে-

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهٗ

যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই।

এই হাদিসটি خَبر হয়েছে। আবার তাতে এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, আমানতদারিতা গ্রহণ কর।

এমনিভাবে আরও একটি হাদিস-

لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদের পড়শীর নামায মসজিদ ব্যতীত শুদ্ধ হবে না।

এই হাদিসটিও خَبر এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার মধ্যেও اِنْشَاء শামিল আছে। অর্থাৎ মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে গিয়েই আদায় করা জরুরি। মোটকথা প্রত্যেক খবরে ইনশা লুকায়িত থাকে। এমনিভাবে,

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْاهُمْ

আয়াতটিও خَبر। কিন্তু তাতেও اِنْشَاء লুকায়িত আছে। অর্থাৎ এতে হুকুম আছে পূর্ববর্তী নেক লোকদের ইত্তেবা (আনুগত্য-অনুসরণ) কর। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হবে। এর দ্বারাই জান্নাত পাওয়া যাবে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা তাকলিদ ওয়াজিব সাব্যস্ত হল।

তাকলিদ মানুষের সবসময় প্রয়োজন

তাকলিদ অর্থাৎ অতীত লোকদের অনুসরণ করা। এটি মানুষের শুধু শরয়ী প্রয়োজন এমন নয় বরং জ্ঞানগত এবং বুদ্ধিগত দিক থেকেও অত্যন্ত জরুরি। তাকলিদ ব্যতীত মানুষ একটি ধাপও সামনে এগুতে পারে না। তাই কেউ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকদের তাকলিদ করে। আবার কেউ পুণ্যবানদের তাকলিদ করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, শিশু তার পিতার আঙুল ধরা ব্যতীত দাঁড়াতে পারে না। কোনো কামার, কোনো স্বর্ণকার, শিল্পী তার বিগত লোকদের ইত্তেবা ও অনুসরণ ব্যতীত সেই শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কোনো ইনজিনিয়ার, কোনো বিজ্ঞানী পূর্ববর্তীদের অনুসরণ ব্যতীত গবেষণাকর্ম সামনে এগিয়ে নিতে পারে না।

অনুরূপভাবে দীনের ক্ষেত্রেও আমাদের কারো-না-কারো অনুসরণ করা জরুরি। এখন সাধারণ লোকদের ইচ্ছা। চাইলে তারা পুণ্যবান মানুষদের অনুসরণ করবে অথবা খারাপ লোকদের অনুসরণ করবে। হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, তোমরা যে যার তাকলিদ করতে তারা তাদের পশ্চাদগামী হও। যে রামের পূজা করতে সে রামের পিছু নাও। আর যে রাবণের পূজা করতে সে রাবণের (রাক্ষসরাজের) পিছু নাও।

এই হাদিসে এটাও আছে যে, মুমিনগণ বলবে, আমরা আল্লাহর অনুসরণ করেছি। আমরা আল্লাহর পিছনে যাব। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ইমামদের অনুসারীরা ইমামগণের অনুসরণ করে না; বরং তারা আল্লাহর অনুসরণ করে। এই হাদিসে এ কথা বলা হয়নি যে, কিছু মুমিন বলবে, আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুসরণ করতাম। আমরা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসরণ করতাম। বরং সকল মুমিনগণ বলবে, আমরা আল্লাহর অনুসরণ করতাম, কাজেই আমরা আল্লাহর পিছনেই যাব।

মোটকথা তাকলিদ ছাড়া কেউ চার ধাপও চলতে পারবে না। গায়রে মুকাল্লিদরা বলে, আমরা কারো অনুসরণ করি না। তারা যেন চিন্তা করে, তারা কার কাছে গিয়ে কুরআন ও হাদিসের উদ্দেশ্য এবং অর্থ জিজ্ঞেস করে আমল করে? অবশ্যই প্রত্যেক গায়রে মুকাল্লিদকে তার বড়দের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে। তাদের বড়রা ভুল বলে দিক বা শুদ্ধ বলে

দিক; বড়দের পিছনেই তাদের চলতে হয়। সুতরাং তাকলিদ এমন একটি প্রয়োজন, যা জাগতিক ব্যাপারে হোক বা দীনী ব্যাপারে, মানুষ তার জীবনকে তাকলিদ ব্যতীত এক ধাপও সামনে এগিয়ে নিতে পারে না।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাকলিদ করতে হবে?

প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় ভালো করে বুঝে নিন। যেসব বিষয় কুরআন অথবা হাদিসে সরাসরি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে সেগুলোতে কোনো ইমামের তাকলিদ করতে হবে না বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের তাকলিদ করতে হবে। ইমামদের তাকলিদ শুধু তিন প্রকার মাসআলার ক্ষেত্রে করা হয়।

এক. যেসকল বর্ণনা বিতর্কিত এবং পরস্পরবিরোধী। সেগুলোর ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয়। যেমন নামাযে রাফ্য়ে ইয়াদাইন তথা দুহাত ওঠানোর হাদিসও আছে। আবার পুরো নামাযে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত হাত না ওঠানোর বর্ণনাও হাদিসে আছে। এখন এই অবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ কী করবে? দুটি আমল একসাথে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে একটি আগের এবং অপরটি পরের আমল। এই বিষয়টির সমাধান কে করবে? দীনের ইমামগণই সমাধান করতে পারবেন। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তাকলিদ করা জরুরি। সুতরাং যদি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রতি আপনার আস্থা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে তাকে জিজ্ঞেস করুন। এই দুই আমলের মধ্যে কোন্ আমলটি আগের এবং কোন্ আমলটি পরের? যদি ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রতি আপনার আস্থা থাকে তা হলে আপনি তাকেই জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করা ছাড়া তো কোনো রাস্তা নেই। এরূপ দুই রিওয়ায়েতের মধ্যে যেটি আগের সেটি মানসুখ বা রহিত হয়ে যাবে আর যেটি পরের তা হবে নাসেখ বা বিলুপ্তকারী। যদি রিওয়ায়েতের মধ্যে কোনো সন বা তারিখ উল্লেখ না থাকে তা হলে মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদ করে তার সমাধান বের করে দিবেন।

দুই. একটি হাদিসের দুটি অর্থ একসাথে একই সময়ে উদ্দেশ্য হতে পারে না। অন্তর যদি উভয় দিকেই ধাবিত হয় তা হলে কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে? এ বিষয়টিও তাকলিদের সুপথের মাধ্যমেই মীমাংসিত হতে পারে। যে ব্যক্তির যে ইমামের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অটুট হবে তিনি তার কাছে

জিজ্ঞেস করে নিবেন। যে ইমাম সাহেবের নিকট যে অর্থ অগ্রগণ্য হবে তিনি তা গ্রহণ করে নিবেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হল,

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ

হযরত বেলাল রা. কে হুকুম দেওয়া হল আযানের শব্দগুলো জোড় বলার জন্য এবং ইকামতের শব্দগুলো বিজোড় বলার জন্য। এখানে ইকামত বিজোড় বলার উদ্দেশ্য কী? এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. আযানের শব্দগুলো বিজোড় পড়া। অর্থাৎ যে শব্দগুলো একজাতীয় সেগুলো একবার পড়া।

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শব্দগুলো বিজোড় পড়া উদ্দেশ্য নয়। বরং শব্দগুলোর আওয়াজ বিজোড় করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজাতীয় দুই শব্দের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ না করে বরং এক নিঃশ্বাসেই শব্দগুলো বলা। যেহেতু আযানের ক্ষেত্রে একজাতীয় শব্দের মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয়। কেননা আবু দাউদ শরিফে হযরত আবু মাহযুরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইকামতের সতেরটি শব্দ শিখিয়েছেন। এই হাদিসের আলোকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটিও হতে পারে। সুতরাং যে ইমামের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন হবে, তার কাছে জিজ্ঞেস করে আমল করবে।

তিন. কুরআন এবং হাদিসের উপরিভাগে মাসআলা-মাসায়েল ভাসা ভাসা থাকে না বরং ডুব দিয়ে সেগুলোর গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং শরীয়তের হুকুম বের করা জরুরি হয়। কিন্তু সাগরে সবাই ডুব দিতে পারে না। যে ডুবুরি পেশায় অধিক পারদর্শী কেবল সেই ডুব দিতে পারে। যেমন, যদি পুরুষ এবং নারীর শুক্রাণু মিলিয়ে টিউবে রাখা হয় আর এর ফলে বাচ্চা সৃষ্টি হয় তা হলে এই বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে কি না? বাচ্চা হালালযাদা হবে নাকি হারামযাদা? কুরআন-হাদিসে এমন মাসআলার সমাধান সরাসরি উল্লেখ নেই। এমন মাসআলার সমাধান ফকীহগণই বের করতে পারেন। আমরা এবং তোমরা তা বের করতে সক্ষম নই। ইমামগণ হলেন বিজ্ঞ ডুবুরি। সুতরাং তারাই কুরআন ও হাদিসের গভীরে ডুব দিয়ে বাস্তবে উদ্ভূত জটিল সমস্যার সমাধান বের করে আনবেন। এমন মাসআলাগুলোকে ইসতেমবাতী মাসআলা বলা হয়। আর এ

মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রেই ইমামগণের তাকলিদ জরুরি। কিছু দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা বলে তোমরা কুরআন ও হাদিসের উপর আমল করছ না বরং আবু হানিফা এবং শাফেয়ীর কথার উপর আমল করছ।

ব্যাপারটা এমন নয়। শুধু তিনপ্রকার মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয়। কেননা সেসব মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলিদ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। কাউকে-না-কাউকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যা বলেন তার উপর চলতে হবে। তবে কুরআন ও হাদিসে যেসকল মাসআলা সরাসরি উল্লেখ আছে তাতে কারো কোনো তাকলিদ নেই।

তাকলিদ ওয়াজিব হওয়ার দলিল চাওয়া উচিত নয়

শেষ কথাগুলো বলছি। ওয়াজিব দুই প্রকার। ১. ওয়াজিব লি আইনিহী। ২. ওয়াজিব লি গায়রিহী।

অর্থাৎ প্রথমটি নিজে নিজেই ওয়াজিব হয়। আর দ্বিতীয়টি নিজে নিজেই ওয়াজিব হয় না বরং অন্যের কারণে ওয়াজিব হয়। তাই প্রথমটিকে বলা হয় ওয়াজিব লি আইনিহী। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ওয়াজিব লি গায়রিহী।

এখন মূলনীতি শুনুন। ওয়াজিব লি আইনিহীর জন্য আপনি দলিল চেয়ে বলতে পারেন যে, তার দলিল কী? যেমন হানাফীদের মতে বিতিরের নামায ওয়াজিব। আপনি এর দলিল জিজ্ঞেস করতে পারবেন। কিন্তু ওয়াজিব লি গায়রিহীর জন্য কোনো দলিল জিজ্ঞেস করা হয় না। কারণ তা অন্যের কারণে ওয়াজিব হয়। সুতরাং একটু ভেবে দেখুন। সেই 'গায়রে'র মধ্যে কি সেই যোগ্যতা আছে যে তাকে ওয়াজিব করবে? যদি যোগ্যতা থেকে থাকে তা হলে ওয়াজিব। আর যদি ওয়াজিব করার যোগ্যতা না থাকে তবে ওয়াজিব নয়।

তাকলিদ যেই দ্বিতীয় জিনিসের কারণে ওয়াজিব হয় তা হল 'গায়র' তথা দীনের ইলম না থাকা। যেব্যক্তির দীনের জ্ঞান নেই তার জন্য ওয়াজিব হল সে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

সুতরাং যেসকল মুসলমানের মধ্যে এই 'গায়ের' পাওয়া যাবে অর্থাৎ দীনকে পরিপূর্ণভাবে জানবে না, তাদের জন্য জরুরি হল জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করা। ওই বেচারা তো দীনই জানে না। আবার যদি তাকে জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করা হয় তা হলে সে দীনের উপর কীভাবে আমল করবে? হ্যাঁ, যদি কেউ এমন হয় যে, সে সরাসরি কুরআন ও হাদিস বুঝতে সক্ষম, তার মধ্যে প্রকৃতই এই যোগ্যতা আছে, তবে তার জন্য তাকলিদ করা ওয়াজিব নয়। তাকলিদ আমাদের মতো মানুষের জন্য। কেননা, আমরা কুরআন ও হাদিস সরাসরি বুঝতে সক্ষম নই। মোটকথা নিজে নিজেই কুরআন ও হাদিস বুঝতে না পারার কারণেই তাকলিদ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

এবার আলোচ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করুন। আমাকে আলোচনার বিষয় দেওয়া হয়েছিল, 'গোমরাহীর বড় কারণ তাকলিদ পরিত্যাগ করা'। আমি এই শিরোনাম পাল্টে দিয়েছিলাম। শিরোনাম দিয়েছিলাম 'গোমরাহীর বড় কারণ অনভিজ্ঞ গোমরাহ লোকদের তাকলিদ'। কেননা তাকলিদ ব্যতীত মানুষের গাড়ি একধাপও চলতে পারবে না, সেটা জাগতিক ব্যাপারে হোক অথবা দীনী ব্যাপারে। প্রত্যেক বিষয়ে তাকলিদ প্রয়োজন। এখন হয়তোবা গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত ব্যক্তিদের তাকলিদ করবেন, যারা কুরআন এবং হাদিসের ব্যাপারে পারদর্শী। অন্যথায় চতুর ও ভেল্কিবাজদের তাকলিদ করতে হবে, চার পয়সার মৌলবীর তাকলিদ করতে হবে। মহান ব্যক্তিদের তাকলিদ করবেন, তা হলে জান্নাতে যাবেন। অনভিজ্ঞ আর হাতুড়ে লোকদের তাকলিদ করবেন তো জাহান্নামে যাবেন। সুতরাং গোমরাহীর বড় কারণ হল অনভিজ্ঞ লোকদের তাকলিদ করা। এ থেকে বাঁচার পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহীহ পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চার মাযহাব গ্রহণ করার তাকিদ এবং বর্জন করা ও তার থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

(শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. রচিত
'রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া ২:৬৭৩' থেকে সংগৃহীত)

চার মাযহাব মানার মাঝে অনেক উপকারিতা বিদ্যমান। আর তা থেকে বের হওয়া বড় ধরনের ফিতনার কারণ। এ ব্যাপারে তিনটি দলিল নিম্নে পেশ করা হল।

প্রথম দলিল

উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, তারা শরীয়ত জানার ক্ষেত্রে তাদের সালাফ তথা পূর্বসূরিদের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তাবেয়ীগণ সাহাবীদের উপর আর তাবেতাবেয়ীগণ তাবেয়ীদের উপর নির্ভর করেছেন। এমনিভাবে উম্মতের প্রত্যেক স্তরের আলেমগণ পূর্বসূরিদের উপর নির্ভর করবেন। এই পন্থাটি বিবেক ও যুক্তির নিরিখেও পছন্দনীয়। কেননা, দীনের জ্ঞান লাভের বিষয়টি হয়তো নকলের (এক স্তর অন্য স্তরের কাছে বর্ণনার) মাধ্যমে সাধিত হবে অথবা ইসতেমবাতের মাধ্যমে দীনের জ্ঞান লাভ হবে। আর প্রত্যেক স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকে অবিরতভাবে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা ছাড়া নকলের (এক স্তর অন্য স্তরের কাছে পৌছানো) সঠিক পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। আর ইসতেমবাতের জন্য জরুরি হল পূর্ববর্তীদের মাযহাব জানা। যেন কোনো স্থানে তাদের মত থেকে বের হওয়ার কারণে ইজমা লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয়ে না পড়ে। আর নিজের কথা তাদের কথার উপরই ভিত্তি করতে হবে। যেন এ ব্যাপারে তাদের মত থেকে সাহায্য নেওয়া যায়। এজন্য সকল বিদ্যা- যেমন, ইলমে সরফ, নাহব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাব্যচর্চা, কামারগিরি, কাঠমিস্ত্রীর পেশা ও

অলঙ্কারশিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিদ্যা এই পদ্ধতিতেই অর্জন হতে পারে। অভিজ্ঞদের সংশ্রব ছাড়া বিদ্যা অর্জন করে পাণ্ডিত্য লাভ করা যদিও যুক্তির নিরিখে সম্ভব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা খুবই বিরল।

যখন এটি নির্ধারিত হল যে, পূর্ববর্তীদের কথার উপর ভরসা করা জরুরি। তখন এটাও জরুরি যে, তাদের গ্রহণযোগ্য সঠিক মত বিশুদ্ধ সনদের সাথে বর্ণিত হতে হবে। অথবা তাদের প্রসিদ্ধ কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও জরুরি যে, সেই প্রসিদ্ধ কিতাবের উপর কাজ করা হয়েছে (তথা সেই কিতাবের উপর টীকা, ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্যাদি লিখিত হয়েছে)। সেই কিতাবগুলোর উপর এমনভাবে কাজ করা হয়েছে যে, তাতে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি রাজেহ্ (বা অগ্রগামী) তা বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে বর্ণিত উমুমকে তাখসিস করা হয়েছে। কিছু স্থানে মুতলাক বিষয়কে মুকাইয়াদ করা হয়েছে। তার বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার পদ্ধতি খোঁজ করা হয়েছে। সাথে সাথে সমন্বয় করার কারণও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলো ব্যতীত কিতাবটির উপর ভরসা করা ঠিক হবে না। বর্তমানে চার মাযহাব ব্যতীত কোনো মাযহাবের কিতাবের অবস্থা এমনটি নয়। অবশ্য মাযহাবে ইমামিয়্যা এবং মাযহাবে যায়দিয়ার মাঝে এমন পদ্ধতি কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু তারা গোমরাহ সম্প্রদায়। এজন্য তাদের কথার উপর ভরসা করা যাবে না।

দ্বিতীয় দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ

তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর।

যেহেতু চার মাযহাব ব্যতীত সকল মাযহাব বিলীন হয়ে গেছে। এজন্য এই চার মাযহাবের অনুসরণ হবে সাওয়াদে আযম (বড় দল) এর অনুসরণ। আর তার থেকে বের হওয়াটা হবে সাওয়াদে আযম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শামিল।

তৃতীয় দলিল

বর্তমানযুগ যেহেতু রিসালাতের যুগ হতে অনেক দূরবর্তী এবং বিশ্বস্ততাও উঠে গেছে। এজন্য যালেম কাজী ও মুফতিগণের কথার উপর ভরসা করা জায়েয নেই। তারা আত্মার প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কোনো কথা সরাসরি অথবা আকার-ইঙ্গিতে পূর্ববর্তী কারো প্রতি নিসবত না করবেন, যিনি সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও পাণ্ডিত্যের পূর্ণতায় মশহুর ছিলেন আবার তার কথাগুলোও সংরক্ষিত আছে। আর এমন ব্যক্তির কথার উপর নির্ভর করা জায়েয নেই, যার ব্যাপারে আমরা জেনেছি যে, তিনি ইজতিহাদের শর্তাবলিতে উত্তীর্ণ নন।

সুতরাং যখন আমরা ওলামা-মাশায়েখকে দেখবো, তারা পূর্ববর্তীদের মাযহাব হিফাযত করার ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ তখন আশা করা যায় তারা তাদের ওই সকল মাসআলার ব্যাপারেও সত্যবাদী, যা তারা পূর্ববর্তীদের কথা থেকে বের করেছেন অথবা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে ইসতেমবাত করেছেন। তবে আমরা যখন আলেমদের মাঝে এই বিষয়গুলো দেখবো না, তখন তাদের কথা বিশুদ্ধ মনে করার কোনো কারণ নেই। হযরত উমর রা. এর একটি বাণীতে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন, 'মুনাফিক লোকের কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা ইসলামকে ধ্বংস করার নামান্তর।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বাণীতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন, 'যার অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়, সে যেন অতীত লোকদের অনুসরণ করে।'

শাহ সাহেব ইকদুল জিদ-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে মাযহাবের বিজ্ঞজন এবং মাযহাবের কিতাবাদির হাফেযের বর্ণনায় চতুর্থ মাসআলায় লিখেন, তাকলিদ দুই প্রকার। ১. ওয়াজিব এবং ২. হারাম। অতঃপর উভয়টির দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন। ওয়াজিব 'তাকলিদকে দালালাতান রিওয়ায়েতের অনুসরণ' সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'যেব্যক্তি কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ তার জন্য নিজে নিজেই গবেষণা ও ইসতেমবাত করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং আবশ্যকভাবে সে কোনো ফকীহর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে যে, অমুক মাসআলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী হুকুম আরোপ করেছেন? আর যখন সেই ফকীহ তাকে

মাসআলা বলে দিবেন, তখন সে তার ইত্তেবা ও অনুসরণ করবে। সেই ফকীহর কথা সরাসরি নস থেকে সংগৃহীত হোক বা ইসতেমবাত করা বিষয়াবলি থেকে হোক অথবা হোক কোনো মানসুসের উপর কিয়াস করা বিষয়াবলি থেকে। এই পদ্ধতিগুলো মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনার কয়েকটি পদ্ধতি। যদিও এই রিওয়ায়েত বা বর্ণনাগুলো দালালাতান হয়েছে। আর এই পদ্ধতির বিশুদ্ধতার উপর শুধু যুগের পর যুগ নয় বরং সকল যুগের উম্মত তাদের শরীয়তের ব্যাপারে এ পদ্ধতির উপর একমত।'

শাহ সাহেব রহ. যেখানে তাকলিদের সমালোচনা করেছেন, তা ওই তাকলিদের ব্যাপারে, যেখানে নবী নন এমন ব্যক্তিকে 'ওয়াজিবুত-তআত' হওয়ার স্তর দেওয়া হয়। আর তার কথার বিপরীতে সহীহ হাদিসকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়।

চার মাযহাবের তাকলিদ জায়েয হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা

পুরো উম্মত বা তাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ (তথা হকপন্থীগণ) সর্বজনবিদিত ও নির্বাচিত এই চার মাযহাবের তাকলিদ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এই ইজমা আজ অবধি বিদ্যমান আছে। এই তাকলিদের মধ্যে যেসব উপকার আছে তা অস্পষ্ট কোনো বিষয় নয়। বিশেষভাবে বর্তমানে আমরা যখন হীনম্মন্যতায় ভুগছি এবং আমাদের অন্তরাত্মাকে প্রবৃত্তি অনুসরণ করার নেশা পান করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই স্বীয় মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে নিজ নিজ সিদ্ধান্তের উপর গর্ব করে।

শাহ সাহেব রহ. 'ইনসাফ' নামক গ্রন্থে আরও লিখেছেন, 'দুই শত শতাব্দীর পরের লোকদের মধ্যে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের তাকলিদ করার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর অনেক কম লোক এমন থেকে যায়, যারা নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবের উপর আস্থা রাখেননি। আর এটিই ওই যমানায় ওয়াজিব ছিল। অর্থাৎ নবীর যুগ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে উম্মতের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেই নিজের মতের প্রতি অনুরক্ত

ছিল। তাই এই রোগের প্রতিষেধক তাকলিদে শাখসী তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এজন্য তাকলিদে শাখসী তথা ব্যক্তির অনুসরণ ওই যমানা থেকেই শুরু হয়েছে।

তাকলিদ কার জন্য জায়েয

'হাযমিয়্যাহ' মতাদর্শের গোড়াপত্তনকারী ইবনে হাযম আলী ইবনে আহমদ যাহেরী আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিজরী) বলেন, তাকলিদ করা হারাম। কারো জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ব্যতীত অন্যকারো কথাকে দলিল-প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয নেই। তিনি তার দাবির পক্ষে চারটি দলিল পেশ করেছেন। দলিলগুলো নিম্নরূপ।

প্রথম দলিল

সুরা আরাফের ২নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

তোমরা অনুসরণ কর তার, যিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে আউলিয়াদের (বন্ধুদের) অনুরসণ করো না।

সুরা বাকারার ১৭০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

আর যখন কেউ ওই লোকদের বলে, আল্লাহ তায়ালা যে হুকুম পাঠিয়েছেন, তার অনুসরণ কর। তখন তারা জবাব দেয়, না, আমরা ওই পথেই চলব, যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি।

সুরা যুমারের ১৭ নং আয়াতে তাকলিদ না করা ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

সুতরাং আপনি আমার ওই সকল বান্দাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, যারা আল্লাহর কালামকে মন দিয়ে শ্রবণ করে। অতঃপর তারা ভালো ভালো কথার উপর চলে। এরাই তারা, আল্লাহ যাদের হিদায়েত দিয়েছেন এবং এরাই হল বুদ্ধিমান।

সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হও তা হলে সেটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাছে সোপর্দ কর, যদি তোমরা আল্লাহর উপর এবং আখিরাতের দিনের উপর ঈমান এনে থাক।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মতবিরোধের সময় কুরআন এবং হাদিস ব্যতীত অন্যকারো প্রতি ব্যাপারটি ন্যস্ত না করার কথা বলেছেন। আর এ আয়াত দ্বারাই মতবিরোধের সময় বিষয়টি যেকোনো ধরনের ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করাকে হারাম করেছেন। কারণ, যার উপর বিষয়টি ন্যস্ত করা হবে সে ব্যক্তি কুরআন এবং হাদিস ব্যতীত অন্য কিছু।

দ্বিতীয় দলিল

তাকলিদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে খাইরুল কুরুন তথা উত্তম তিন যুগে ইজমা হয়েছে। সকল সাহাবী, সকল তাবেয়ী ও সকল তাবেতাবেয়ী একমত যে, কোনো ব্যক্তি পূর্বাপর কোনো ব্যক্তির প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করবে না যে, সে তার সকল কথাই গ্রহণ করে নিবে।

সুতরাং ওই ব্যক্তি যেন খুব ভালো করে বুঝে নেয়, যে ইমাম আবু হানিফা অথবা ইমাম মালেক রহ. অথবা ইমাম শাফেয়ী রহ. অথবা ইমাম আহমদ রহ. এর সকল কথার অনুরসণ করে; তাদের ছাড়া অন্যকারো অনুসরণ করে না এবং কুরআন ও হাদিসের আহকামকে (তাদের) কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত নিসবত করা না হয়, তার উপর ভরসা করে না। এমন ব্যক্তি পুরো উম্মতের বিরোধী। এই কথা চিরসত্য এবং সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে যে, খাইরুল কুরুনে

এই ধারণা পোষণকারী একজনও ছিল না। সুতরাং এমন ব্যক্তি সুনিশ্চিতভাবে মুমিনদের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা সে ঈমানহীন লোকদের রাস্তা গ্রহণ করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

তৃতীয় দলিল

সকল ফকীহ তার নিজের এবং অন্যের তাকলিদ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যারা তার তাকলিদ করে তারা ওইসব ফকীহর বিরোধিতা করে।

চতুর্থ দলিল

বিষয়টি কী, যার কারণে ওই ফকীহদের তাকলিদ উত্তম হয়ে গেল এবং ভালো হওয়ার স্বীকৃতি পেল? হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবদুল্লাহ হযরত ইবনে উমর রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং হযরত আয়েশা রা. এর তাকলিদ কেন করা হয় না? যদি তাকলিদ জায়েযই হয়ে থাকে তা হলে তো এই হযরতগণের প্রত্যেকেই এর জন্য উপযুক্ত। তাদের তাকলিদই করা হোক। অন্যদের তুলনায় এই মহান ব্যক্তিগণ পথপ্রদর্শক হওয়ার জন্য সর্বাধিক যোগ্য।শাহ সাহেব রহ. বলেন, ইবনে হাযমের কথা শুধু চার প্রকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম ব্যক্তি

ওই ব্যক্তি, যার যথাযথভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে। যদিও তা একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হয়। অর্থাৎ মুজতাহিদের জন্য তাকলিদ হারাম। যিনি সকল মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদ তার জন্য সকল মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলিদ হারাম। আর যিনি শুধু এক মাসআলার মুজতাহিদ তার জন্য একটি মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হারাম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওই ব্যক্তি, যার নিকট প্রকাশ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ করেছেন এবং এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর এ বিষয়টিও তার জানা আছে যে, এই আদেশ বা নিষেধ

রহিত হয়নি। এ বিষয়টি জানার দুটি পদ্ধতি আছে। ১. তিনি মাসআলার ব্যাপারে হাদিসসমূহ এবং মাসআলার বিপরীত ও অনুকূলের মতসমূহ ভালোভাবে খোঁজ করেছেন। কিন্তু তার কোনো নাসেখ বা রহিতকারী পাননি।

২. তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিগণের সিংহভাগ তার মতের দিকেই ধাবিত। আবার তার এই মতের বিরোধিতাকারীদের কাছে কিয়াস, ইসতেমবাত অথবা এজাতীয় দলিল ব্যতীত অন্যকোনো দলিল নেই।

সুতরাং এমন অবস্থায় অন্তরে ভণ্ডামি লালনকারী অথবা বোকামি ব্যতীত হাদিসের বিরোধিতা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আর এমন ব্যক্তির দিকেই আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রহ.[১৫] ইঙ্গিত করে বলেন, 'অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, মুকাল্লিদ ফকীহগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ তার ইমামের ভিত্তির দুর্বলতা সম্পর্কে জানে। এমন দুর্বল যাকে দূর করার কোনো বস্তু নেই। এরপরও সে ওই ইমামের তাকলিদ করে যায়। আর যেই ব্যক্তির মাযহাবের জন্য কুরআন ও হাদিস এবং সঠিক কিয়াসসমূহের দলিল বিদ্যমান আছে তাকে ছেড়ে দেয়। আর নিজ ইমামের তাকলিদের উপর অটল থাকে। বরং কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বিষয়কে বাধাগ্রস্ত করার জন্য হিলা-বাহানার আশ্রয় নেয়। নিজের ইমামের পক্ষ অবলম্বন করে যতসব ভ্রান্ত ও উদ্ভট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকে।'

তিনি আরও বলেন, 'লোকজন সাধারণত ওই আলেমকেই জিজ্ঞেস করতে থাকত, যে আলেমকে তারা সামনে পেত। কোনো মাযহাবের বাধ্যবাধকতা ছাড়া এবং কোনো জিজ্ঞাসাকারীর উপর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই যে, সে অন্যের কাছে কেন মাসআলা জিজ্ঞেস করল? অতঃপর একসময় চার মাযহাবের সৃষ্টি হল। তার সমর্থনকারী কিছু মুকাল্লিদও প্রকাশ হল। তাদের মধ্য থেকে কিছুলোক তাদের মাযহাব দালায়েল থেকে দূর হওয়া

---

১৫. আলেমদের বাদশা আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন আবদুল আযিয বিন আবদুস সালাম দামেশকী রহ. এরপর তিনি কাহেরী রহ.। তিনি সপ্তম শতাব্দীর শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক ফকীহ ছিলেন। তিনি ইজতেহাদের দরজায় পৌছেছিলেন। قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ এবং إِلْمَامُ الْأَحْكَامِ ইত্যাদি তার রচিত গ্রন্থ।

সত্ত্বেও স্বীয় ইমামের অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। তারা এমনভাবে তাদের অনুসরণ করে, যেন তারা প্রেরিত নবী। এ বিষয়টি হক ও সত্য পরিপন্থী, যাকে কোনো বিজ্ঞজন পছন্দ করতে পারে না।'

ইমাম আবু শামা আবদুর রহমান বিন দামেশকী রহ. (৫৯৯-৬৬৫ হিজরী) বলেন, 'যেব্যক্তি ফিকাহর কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত তার জন্য উচিত, তিনি যেন কোনো মাযহাবের ইমামের উপর তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না করে। আর প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে বিষয়টির বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যেন মাসআলাটি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে গায়রে মানসুখার নিকটবর্তী হয়। এ কাজটি ওই ব্যক্তির জন্য সহজ, যিনি অতীত ইলমের বিরাট অংশ (নিজের জন্য) সুগঠিত করে নিয়েছেন। আর তার জন্য স্বজনপ্রীতি এবং পূর্বসূরিদের মতবিরোধ থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা, এ বিষয়টি সময় বিনষ্টকারী এবং স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যমানাকে কলঙ্কিত করার সমতুল্য। ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নিজের এবং অন্যদের তাকলিদ করতে নিষেধ করেছেন। তার অনুগত ছাত্র ইমাম মুযানী ও ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া রহ. (১৭৫-২৬৪ হিজরী) তার 'মুখতাসার' কিতাবের শুরুতে লিখেছেন, 'আমি এই কিতাব ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ইলম ও আকওয়ালের মর্ম থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি। যেন আমি এই কথাগুলো ওই ব্যক্তির নিকটবর্তী করতে পারি, যে এগুলো অর্জন করার ইচ্ছা রাখে। আর সাথে সাথে তাকে আমি এ কথাও বলে দিই যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. তার নিজের এবং তিনি ছাড়া অন্যদের তাকলিদ নিষেধ করেছেন।'

তৃতীয় ব্যক্তি

ওই অন্ধ, যে একজন নির্দিষ্ট ফকীহর তাকলিদ করে। আর মনে করে, তিনি এমন ব্যক্তি, যার থেকে ভুল হতে পারে না। তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য। আর সে অন্তরে এই কথা শক্ত করে বসিয়ে নেয় যে, আমি কোনোভাবেই তার তাকলিদ পরিত্যাগ করব না। তার বিপরীত কোনো দলিল সামনে এসে গেলেও না। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওই রিওয়ায়েত প্রযোজ্য, যা ইমাম তিরমিযী রহ. আদি ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরা তাওবার ৩১নং আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি। সেই আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম ও মাশায়েখকে রব বানিয়ে রেখেছিল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ওই সকল লোক তাদের ইবাদত করত না; বরং যখন তারা কোনো জিনিস তাদের জন্য হালাল করত, তখন তারা তাকে হালাল মনে করত। আর যখন কোনো জিনিস হারাম করে দিত, তখন তাকে হারাম মনে করত।'[১৬]

চতুর্থ ব্যক্তি

যেব্যক্তি কোনো হানাফী কর্তৃক শাফেয়ী থেকে অথবা কোনো শাফেয়ী কর্তৃক হানাফী থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করুক এ কথা বৈধ মনে করে না। অথবা কোনো হানাফী কোনো শাফেয়ীর ইকতিদা করার বিষয়টিও জায়েয মনে করে না। কেননা যেব্যক্তি এমন করে সে কুরুনে আউয়ালের মহান ব্যক্তিদের ইজমার বিরোধিতা করে এবং সাহাবা ও তাবেয়ীদেরও বিরোধিতা করে।

ইমামগণের সুপ্রসিদ্ধ তাকলিদ ইবনে হাযমের কথার লক্ষ্য নয়

ইবনে হাযম যাহেরীর সাধারণভাবে তাকলিদ হারাম হওয়ার কথার উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি নয়, যে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল ও কথাকে দীন মানে। আর শুধু সেইসব জিনিসকেই হালাল এবং হারাম মনে করে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল হালাল বা হারাম করেছেন। কিন্তু যেহেতু সেই ব্যক্তি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? আর সে বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে সমন্বয় করার পদ্ধতিও জানে না। আর নবীজির কথা থেকে আহকাম ইসতেমবাত করার পন্থাও সে অবগত নয়। এজন্য সে কোনো হিদায়েতপ্রাপ্ত আলেমের অনুসরণ করে। আর সে এই মনে করে তাকলিদ করে যে, এই আলেম যা কিছু বলে বা যে ফতোয়া দেয়, তাতে সে সঠিক এবং সত্যবাদী। আর এ কথাও প্রকাশ

---

১৬. তিরমিযী ২খ: ১৩৬ পৃ: কিতাবুত তাফসীর

থাকে যে, সেই আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের স্পষ্ট অনুসারী। অতঃপর যদি সেই মুকাল্লিদ উক্ত আলেমের কথার বিপরীত কোনোকিছু কোনো বিষয় পেয়ে যায় তা হলে সে কোনো ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়ে ফিরে আসে। তা হলে বলুন, এই ধরনের তাকলিদকে কেউ অস্বীকার করতে পারে?

আলেমগণের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা এবং মাসআলার সমাধান বলে দেওয়ার ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকেই চলে আসছে। এর নামই হল তাকলিদ। কখনো এক আলেমকে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে বা কখনো অন্যজনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে অথবা অপরজনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে এতে কী অসুবিধা? যখন তার দৃঢ় ইচ্ছা আছে যে, যদি এই আলেমের কোনো কথার বিপরীত কোনো বিষয় দলিল হিসাবে আসে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই আলেমের কথা ছেড়ে দিবে।

আর তাকলিদ কীভাবে অশুদ্ধ হতে পারে? আমরা কোনো ফকীহ ব্যক্তির উপর তো এই বিশ্বাস রাখি না যে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর ফিকহের অহী পাঠিয়েছেন আর আমাদের উপর তার আনুগত্য ফরয করে দিয়েছেন। আমরা এটাও মানি না যে, তারা নিষ্পাপ। যদি আমরা তাদের মধ্য থেকে কারো অনুসরণ করি তা হলে শুধু এই মনে করেই করি যে, তারা শুধু আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নতের আলেম। তার কথা তিন অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

১. হয়তোবা তার কথা সরাসরি কুরআন এবং সুন্নতের কথা।

২. অথবা তা কোনোভাবে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে ইসতেমবাত করা হয়েছে।

৩. আর না হয় তিনি কোনো করিনা তথা নির্দেশনার মাধ্যমে এ কথা বুঝতে পেরেছেন। তা এইভাবে যে, অমুক অবস্থার হুকুমটি অমুক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। আর এই অবস্থার পরিচয়ের উপর সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণেই তিনি গায়রে মানসুস্কে (কুরআন-হাদিসের কোথাও নেই এমন) মানসুসের উপর কিয়াস করে থাকেন। সুতরাং তিনি যেন এই বলে থাকেন, 'আমার ধারণা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এটা বলেছেন যে, যেখানে যেখানে এই ইল্লত (বা কারণ) পাওয়া যাবে সেখানে সেখানে এই হুকুম হবে।' আর মাকিস (যাকে কিয়াস করা হয় তা) মাকিস আলাইহির (যার উপর কিয়াস করা হয়) এই উমুম বা ব্যাপাকতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। কিন্তু এটি একটি ধারণা। আর এই কারণেই কিয়াস যন্নি (ধারণামূলক) হুকুম হয়ে থাকে, অকাট্য হুকুম হয় না। আর যদি এই বিষয়টি না হত (অর্থাৎ কিয়াসী হুকুমগুলো ইঙ্গিতপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা না হত) তা হলে কোনো মুমিন কখনো কোনো মুজতাহিদের তাকলিদ করত না (কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়)।

এখন যদি সেই নিষ্পাপ রাসূলের কোনো ভালো হাদিস (দলিল হওয়ার উপযুক্ত) যথাযথ সনদের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যার আনুগত্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর ফরয করেছেন। আর হাদিসটি যদি সেই ইমামের মাযহাবের বিপরীত হয় আর এই অবস্থায় আমরা উক্ত হাদিস ছেড়ে দিয়ে ইমামের ধারণা ও অনুমানের আনুগত্য করি তা হলে আমাদের চেয়ে বড় যালেম কেউ হবে না। যে দিন মানুষ রাব্বুল আলামিনের মুখোমুখি দাঁড়াবে সেদিন কি আমরা কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে পারব?

গায়রে মুকাল্লিদদের শরয়ী বিধান

(তরজুমানে দেওবন্দ- অক্টোবর ২০০১ ও রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগ থেকে সংগৃহীত)

গায়রে মুকাল্লিদ ও মওদুদীপন্থীদের হুকুম কী? হুকুমের দলিল কী? অনেক ভদ্রজনের এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তারা এই উভয় দলকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কারণে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

এই দুটি দলের অনুসারীরা যদিও মুসলমান। কিন্তু তারা নাজাতপ্রাপ্ত সম্প্রদায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আহলে সুন্নাহর সাথে তাদের মতবিরোধ মৌলিক বিষয়ে, শাখাগত বিষয়ে নয়। বিষয়টির প্রমাণপঞ্জি নিম্নরূপ।

প্রথম দলিল

আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাবী রহ. (মৃত্যু ১২৩১ হিজরী) প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ। তিনি আল্লামা শামী রহ. এর উসতাদ। তার (আল্লামা তাহতাবী) আদ্‌দুররুল মুখতার (টীকাগ্রন্থ) চার খণ্ডে প্রকাশিত, যা মুফতাবিহি কিতাবসমূহের একটি। তিনি আদ্‌দুররুল মুখতারের টীকায় 'কিতাবুয-যাবায়েহ' অধ্যায়ে জবাইকারী মুসলমান হওয়ার শর্ত বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন,

فَعَلَيْكُمْ مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاِتِّبَاعِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُسَمَّاةِ بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ نَصْرَةَ اللهِ وَ حِفْظَهُ وَ تَوْفِيْقَهُ فِيْ مُوَافِقَتِهِمْ وَ خَذْلَانَهُ وَ سَخْطَهُ وَ مَقْتَهُ فِيْ مُخَالِفَتِهِمْ، وَهٰذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ

اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِيْ مَذَاهِبَ أَرْبَعَةٍ وَهُمُ الْحَنَفِيُّوْنَ، وَ الْمَالِكِيُّوْنَ، وَ الشَّافِعِيُّوْنَ، وَ الْحَنْبَلِيُّوْنَ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَ مَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَ النَّارِ

সুতরাং হে মুমিনদের জামাত, তোমাদের জন্য আবশ্যক নাজাতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা, যাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয়। কেননা তাদের অনুসরণের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য, তার নিরাপত্তা ও তাওফিক রয়েছে। আর তাদের বিরোধিতার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা, অসন্তুষ্টি ও তার প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে। আর এই নাজাতপ্রাপ্ত জামাত বর্তমানে চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সেই চার মাযহাব হল হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর মেহেরবানী করুন। যারা এই চার মাযহাবের গণ্ডি থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা গোমরাহ ও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। (বিদআত শব্দটি উসূলে হাদিস ও উসূলে ইসলামের কিতাবসমূহে গোমরাহ ফিরকার জন্য ব্যবহার হয়।)

মওদুদী জামাত তো চার মাযহাবের কোনো মাযহাব অনুসরণের প্রবক্তা নয়। বরং তাদের নিকট মূলত তাকলিদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর গায়রে মুকাল্লিদ; তারা তো একটি চিহ্নিত গবেষণার অনুরসণ করে। সুতরাং এই দুটি দল চার মাযহাববহির্ভূত। তাদের হুকুম উপরের ইবারত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলিল

শায়খুত্ তায়েফা, ফকীহুন নফস মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী একটি প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'সাবিলুর রাশাদ', যা প্রকাশিত এবং খুব সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। এটি রশিদিয়া লাইব্রেরির সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে সাতটি জিজ্ঞাসার উত্তর উল্লেখ আছে। গায়রে মুকাল্লিদদের কয়েকটি কথার উত্তরও সেখানে আছে। তাদের পঞ্চম কথা ও তার উত্তর নিম্নরূপ।

পঞ্চম কথা : গায়রে মুকাল্লিদরা বলে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল আহলে হাদিস। আর ওটাই সুন্নত ও জামাত। সুতরাং ফিকহের যেসব মাসআলা হাদিসের বিপরীত হবে সেগুলো ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর মক্কা মুয়াযযমায় বানানো চার মুসাল্লার সবগুলো বিদআত। সুতরাং নিজেদের উপাধি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলীর পরিবর্তে মোহাম্মদী এবং মুয়াহ্হিদ রাখতে হবে।

উত্তর : এই কথাগুলোর উত্তরে যা কিছু লেখা হচ্ছে তা সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যেকেই অবগত। সকল মুজতাহিদ ফকীহ এবং তাদের সকল মুকাল্লিদ কুরআন ও হাদিসের উপর আমলকারী। কেউ কোনো হাদিস রিওয়ায়েত করল আর মতবিরোধের স্থানে তাকে তারজীহ তথা অগ্রাধিকার দিল এবং তার উপর আমল করল। আর কেউ অন্য রিওয়ায়েতের উপর আমল করল। সুতরাং এক্ষেত্রে সকলেই কুরআন ও হাদিসের উপরই আমল করল। কুরআন এবং হাদিস বিরোধী বিষয়কে ছেড়ে দিল। সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূলুল্লাহর উপর আমলকারী। তাদের সকলেই নাজাতপ্রাপ্ত দল এবং সুন্নত ও জামাতের অন্তর্ভুক্ত। নাজাতপ্রাপ্ত দলের ব্যাপারে সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাইন জিজ্ঞেস করলেন, ওই লোকগুলো কারা? তখন তিনি উত্তর দিলেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

সুতরাং সাহাবীদের তরিকা এবং তাদের আনুগত্যই মুক্তির পথ এবং তারাই নাজাতপ্রাপ্ত জামাত। তাই সহীহ হাদিসের হুকুম অনুযায়ী সকল মুজতাহিদ ও তাদের আনুগত্যকারী এবং সকল মুহাদ্দিস নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, যে মূর্খশ্রেণির লোকজন তাকলিদ করার (মূল কিতাবে এমনটিই আছে। কিন্তু শুদ্ধ হবে, তাকলিদ না করার) জোশে সর্বজনবিদিত মুহাদ্দিসগণকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অথবা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী নিজেকে হাদিসের উপর আমলকারী মনে করে বিজ্ঞ ফকীহ ও

মুজতাহিদগণকে গালিগালাজ করে। নুসুস থেকে ইসতেমবাত করা মাসআলাসমূহকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। এসকল লোক নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা প্রবৃত্তির অনুসারী। আহলে হাওয়া বা মনের গোলামদের অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর উল্লিখিত ইবারতের শেষ বাক্যটি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। এই লাগামহীন গায়রে মুকাল্লিদরা 'সাওয়াদে আযম' আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তৃতীয় দলিল

ফতোয়ায়ে জামিউশ শাওয়াহেদে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ., মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ও মুফতি আযিযুর রহমান রহ.-সহ অন্য আলেমগণের দস্তখত এবং সীলমোহর দ্বারা গায়রে মুকাল্লিদদের ব্যাপারে যে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ।

'যখন এই দলের আকিদা-বিশ্বাস অধিকাংশ আহলে সুন্নতের বিপরীত, সুতরাং তারা বিদআতী (ভ্রান্ত ফিরকা)। তারা আল্লাহ তায়ালার জিসিম (শরীর) সাব্যস্তকারী এবং চারের অধিক বিবাহকে হালাল জ্ঞানকারী ও সালাফে সালেহিনের নিন্দাকারী। অথচ এসব বিষয় স্পষ্ট ফাসেকী অথবা কুফরী। সুতরাং নামায, বিবাহ এবং পশু জবাই করার ক্ষেত্রে তাদের থেকে সাবধান থাকা জরুরি, যেমনিভাবে রাফেযী ও খারেজীদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।'

উক্ত ফতোয়াটি লিখেছেন, মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী আফা আনহু, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী আফা আনহু, আবুল খায়রাত সাইয়েদ আহমদ আফা আনহু, মাহমুদ হাসান দেওবন্দী আফা আনহু।

---

১৭. তালিফাতে রশিদিয়া পৃ:৫১৫

চতুর্থ দলিল

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর একটি কিতাব 'মিয়াতু দুরুস'। মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি থেকে প্রকাশিত। ওই কিতাবের ৯৫ নং সবকটি নিম্নরূপ।

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ وَ التِّسْعُوْنَ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُنْتَحِلَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ فِيْ زَمَانِنَا: أَهْلُ الْحَقِّ مِنْهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ، اَلْمُنْحَصِرُوْنَ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُّعْتَدَّ بِهِمْ فِي الْحَنَفِيَّةِ وَ الشَّافِعِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الْحَنَابِلَةِ.

وَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنْهُمْ غَيْرُ الْمُقَلِّدِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِتِّبَاعَ الْحَدِيْثِ وَ أَنَّى لَهُمْ ذٰلِكَ! وَجَهَلَةُ الصُّوْفِيَةِ وَ أَشْيَاعُهُمْ مِنَ الْمُبْتَدِعِيْنَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ فِيْ زِيِّ الْعِلْمِ، وَالرَّوَافِضُ وَ النَّيْجَرِيَّةُ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ الْمُعْتَزِلَةَ، فَإِيَّاهَا وَ إِيَّاهُمْ فَتَدَنَّسَ بِهَوَاهُمْ.

উল্লিখিত ইবারতের অনুবাদ 'মিয়াতু দুরুস' কিতাবের মাঝে এমনটি করা হয়েছে, সবক নম্বর ৯৫; আমাদের যমানায় ওইসকল মাযহাব, যেগুলোকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাদের মধ্য থেকে আহলে হক হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। তা ওই সকল ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ, যাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। তারা হলেন হানাফিয়্যা, শাফেইয়্যা, মালিকিয়্যা ও হানাবিলা। তাদের মধ্য থেকে আহলে হাওয়া বা নফসের অনুসারী হল গায়রে মুকাল্লিদরা। তারা হাদিসের অনুসারী হওয়ার দাবিদার। অথচ তারা আদৌ এই দাবির অধিকার রাখে না। মূর্খ সুফী এবং বিদআতী কিছুলোক তাদের অনুসারী। যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছুলোক আলেম বেশ-ভুষা ধারণকারী। রাফেযী, ন্যাচারীরা মুতাযিলীদের সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি তাদের থেকে বেঁচে থাক। অন্যথায় খাহেশাতে নফসানীর তাড়নায় অপবিত্র হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : اِنْتِحَال শব্দের অর্থ ত্রুটিপূর্ণভাবে ভিত্তি স্থাপিত হওয়া। এই সবকে ওই বাতিল ফিরকাসমূহের আলোচনা করা হবে, যারা নিজেদের ইসলামে সাথে সম্পৃক্ত করে। অর্থাৎ নিজেদের আহলে হক বলে থাকে। এই সবকের শুরুতে আহলে হকের বর্ণনা ভূমিকাস্বরূপ এসেছে। প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্য হল আহলে বাতিলের আলোচনা করা।

قَوْلُهٗ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُّعْتَدِّبِهٖ : এই ইবারতের উদ্দেশ্য হল ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যাদের ঐকমত্য ও মতানৈক্যকে মান্য করা হয়। তাদের আহলে হক হতে হবে। বাতিল দলসমূহের ঐকমত্য কিংবা দ্বিমতের কোনো ভিত্তি নেই। যেমন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হারাম হওয়ার উপর ইজমা। তবে ইবনে হাযম যাহেরী ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি এগুলোর জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। তার এই ভিন্নমত প্রদানের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তুহফাতুল আরব ওয়াল আযমের মধ্যে ইবনে হাযমের কথার উত্তরে বলা হয়েছে, ‘ইবনে হাযমের কথার ভিত্তি নেই। কেননা তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নন বরং তিনি আহলে যাহেরের অন্তর্ভুক্ত।’[১৮]

أَهْلُ الْأَهْوَاءِ : অর্থাৎ আত্মার প্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং আহলে বিদআত তথা গোমরাহ দল চারটি। ১. গায়রে মুকাল্লিদ। ২. বিদআতী (রেজবী)। ৩. শিয়া (রাফেযী) এবং ৪. ন্যাচারী (প্রকৃতিবাদী) যার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ। এরা মুতাযিলীদের ন্যায় বিবেক-বুদ্ধির পূজারী। অতঃপর এই চার দল থেকে দূরে থাকার হিদায়েত করা হয়েছে। যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটির সাথে মিল-মহব্বত রাখে তা হলে খাহেশাতে নফসানী আত্মার প্রবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা অপবিত্র হয়ে যাবে। অর্থাৎ গোমরাহীতেই আবদ্ধ থেকে যেতে হবে।

---

১৮. শরয়ী ফয়সালা পৃষ্ঠা: ৯৪

পঞ্চম দলিল

ইমদাদুল ফাতাওয়ার চতুর্থ খণ্ডে مسائل شتى (বিক্ষিপ্ত মাসায়েল) শিরোনামে ৪৯৩ নং পৃষ্ঠায় গায়রে মুকাল্লিদদের ব্যাপারে একটি প্রশ্নোত্তর আছে, যা হুবহু উল্লেখ করা হল।

প্রশ্ন নং ৫৪৮ : ওলামায়েদীন ও শরীয়তের বিজ্ঞ মুফতিগণ এই সকল মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন, যা বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত। বিশেষভাবে গায়রে মুকাল্লিদ (যারা নিজেদের আহলে হাদিস বলে থাকে এবং তাকলিদে শাখসীকে নাজায়েয বলে থাকে), এবং তাদের মতো আরো যেসকল দল রয়েছে তারা কি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না গোমরাহ সম্প্রদায় রাওয়াফেয ও খাওয়ারেজদের মতো? তাদের সাথে ওঠা-বসা, মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা অজ্ঞ মুকাল্লিদদের জন্য জায়েয আছে কি? তাদের হাতে জবাইকৃত পশু খাওয়া শুদ্ধ হবে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অন্যান্য লোকের জন্য তাদের পিছনে নামায আদায় করা অথবা সেই লোকগুলো মুকাল্লিদদের জামাতে শরিক হওয়া জায়েয আছে কি?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও মুজতাহিদগণের কিয়াস থেকে দলিল গ্রহণ করে মতবিরোধ করলে আহলে সুন্নাহ থেকে খারেজ হয় না। হ্যাঁ, যদি আকিদাগত বিষয়ে মতবিরোধ করে অথবা শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে উল্লিখিত চার উৎস পরিত্যাগ করে তা হলে আহলে সুন্নত থেকে খারেজ হয়ে যায়। বিদআতী লোকের ইকতিদা করা মাকরুহে তাহরিমী। এই মূলনীতি দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের হুকুম বুঝা যায়।

ষষ্ঠ দলিল

ইমদাদুল ফাতাওয়ার ওই চতুর্থ খণ্ডের ৫৮২ নং প্রশ্নে গায়রে মুকাল্লিদের সাথে লেনদেনের বিষয়টিও উল্লেখ আছে। উত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল।

'গায়রে মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব শাখাগত নয়। যদি বিষয়টি এমনই হত তা হলে হানাফী ও শাফেয়ীর মধ্যে কখনোই মিল-মহব্বত থাকত না। সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ এবং দাঙ্গা লেগেই থাকত। অথচ সর্বদা সৌহার্দ্য ও ঐক্য বিরাজমান ছিল। তবে গায়রে মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব মৌলিক। কেননা তারা সালাফে সালেহিনকে বিশেষভাবে ইমাম আযম আলাইহির রাহমাহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে স্মরণ করে থাকে। চারের অধিক বিবাহকে জায়েয সাব্যস্ত করে। হযরত উমর রা. কে তারাবির নামাযের ক্ষেত্রে বিদআতী সাব্যস্ত করে। তারা মুকাল্লিদদের মুশরিক মনে করে। মাযহাবীদের প্রতিহত করতে তারা নিজেদের মুওয়াহ্হিদ অভিহিত করে। ইমামদের তাকলিদ করাকে আরব জাহেলদের প্রথা হিসাবে গণ্য করে। আরব জাহেলরা বলত,

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا

মাআযাল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! তারা আল্লাহ তায়ালাকে আরশের উপর উপবিষ্ট মনে করে।[১৯] তারা ফিকাহর কিতাবকে গোমরাহীর কারণ মনে করে। তারা সর্বদা ষড়যন্ত্রসন্ধানী এবং বিশৃঙ্খলাকারী লোকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এই ধরনের বহু ভ্রান্ত আকিদা তারা পোষণ করে থাকে, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক দীর্ঘ। যেগুলো বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহর অনেক বান্দার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট। বিশেষ করে যারা তাদের

---

১৯. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান আমীরে ভূপাল রচিত গ্রন্থ 'রিসালাতুল ইহতেওয়া আলা মাসআলাতিল ইসতেওয়া'। গুলশান উড লাখনৌ থেকে প্রকাশিত। তিনি সেখানে লিখেন, আল্লাহ আরশের উপর বসে আছেন। আরশ তার স্থান। উভয় পা কুরসীতে রেখেছেন এবং কুরসী তার পা রাখার স্থান। (শরয়ী ফয়সালার সূত্রে- পৃষ্ঠা ৪৫০)

পুস্তিকাগুলো নিরীক্ষণ করেছেন তাদের কাছে তো সূর্য থেকে আরো স্পষ্ট। এ ছাড়া তাদের সত্য গোপন রাখার বদ অভ্যাস আছে। অধিকাংশ কথার ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করে থাকে এবং অস্বীকার করে বসে। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়াবলির আলোকে দীনী এবং দুনিয়াবি ক্ষেত্রে তাদের থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম বিবেচিত হয়।[২০]

সপ্তম দলিল

দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনের সময় দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম হাকিমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিকপর্যায়ের শিক্ষকগণের একটি পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। তখন আমি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ছিলাম। সুতরাং আমিও পরামর্শসভায় অংশগ্রহণ করলাম। সভার আলোচ্যবিষয় ছিল শতবর্ষপূর্তি সভায় কাদের দাওয়াত দেওয়া হবে? পরামর্শসভায় সকলের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল শুধু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে দাওয়াত দেওয়া হবে। অন্যান্য গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দেওয়া হবে না। সুতরাং সর্বপ্রথম গায়রে মুকাল্লিদদের বিষয়টি আলোচনায় এলো। দারুল উলুম দেওবন্দের সকল উসতাদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গায়রে মুকাল্লিদরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তাদের দাওয়াত দেওয়া হবে না। সুতরাং শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনে তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়নি।

অতঃপর মওদুদী জামাতের আলোচনা এলো। প্রাথমিক স্তরের এক শিক্ষক বললেন, তাদের দাওয়াত দেওয়া উচিত। কেননা তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। অন্য একজন শিক্ষক তার বিরোধিতা করে বললেন, তারাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তাদেরও দাওয়াত দেওয়া উচিত হবে না। উক্ত দুই শিক্ষকের মধ্যে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা এ বিষয়ে আলোচনা হল। হযরত হাকিমুল ইসলাম রহ.

---

২০. এমদাদুল ফতওয়া পৃষ্ঠা: ৫৬২ খণ্ড ৪

এবং পুরো মজলিস এই আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনলেন। অবশেষে হযরত হাকিমুল ইসলাম রহ. বললেন, 'আমি আপনাদের আলোচনা শুনেছি। আমার সিদ্ধান্ত হল তাদের দাওয়াত দেওয়া হবে না।'

সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, কোনো মওদুদী আলেমকে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত করা হবে না। অথচ বুকস্টলের জন্য জামাতে ইসলামীকেও জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওই বরাদ্দকৃত জায়গা পরিচালকের আদেশে উড্ড করে নেওয়া হয়। এটি বিশ বছর পূর্বে হাকিমুল ইসলাম রহ. সভাপতিত্বে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল যে, এই দুই দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে শামিল নয়।

অষ্টম দলিল

গায়রে মুকাল্লিদরা নিজেদের 'আহলে হাদিস' বলে থাকে। এখন দেখার বিষয়, 'হাদিস' এবং 'সুন্নত' উভয়টি এক বিষয় কি না? এই দুই দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? যদি এই দুটি বিষয় একই হয় তা হলে নিঃসন্দেহে আহলে হাদিস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তা হলে নামধারী আহলে হাদিস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হল।

সুন্নতের অর্থ হল ইসলামী তরিকা বা اَلطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوْكَةُ فِي الدِّيْنِ। আর হাদিস অর্থ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, সমর্থন, গুণাবলি ও অবস্থাদির নাম। হাদিস ও সুন্নতের মধ্যে আম খাস মিন ওয়াজহিন-এর নিসবত। সুন্নত শুধু ওই সকল হাদিসের নাম, যেগুলোর উপর আমল করা হয়। যা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। মুআউয়াল নয় কিংবা মানসুখ হয়নি। যেমন, সওমে বিসালের রিওয়ায়েত এবং اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ সংক্রান্ত হাদিস সুন্নত নয়।

এমনিভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রচারকৃত দীনী নীতিমালাও সুন্নত। পরিভাষাগতভাবে তার উপর হাদিস শব্দের ব্যবহার হয় না। যেমন- জুমার দিনের প্রথম আযান এবং জামাতের সাথে বিশ রাকাত তারাবির নামায সুন্নত।

সুতরাং ওই সকল হাদিস যেগুলোর উপর আমল করা হয়, সেগুলো মাদ্দায়ে ইজতেমা অর্থাৎ উহা হাদিসও আবার সুন্নতও। اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ সংক্রান্ত হাদিসটি প্রথম মাদ্দায়ে ইফতেরাক। অর্থাৎ তা শুধু হাদিস, সুন্নত নয়। কেননা তা মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। আর জুমার প্রথম আযান হল দ্বিতীয় মাদ্দায়ে ইফতেরাক। অর্থাৎ সেটা শুধু সুন্নত (হাদিস নয়)। হাদিসসমূহের মধ্যে 'সুন্নত'কে শক্তভাবে ধারণ করার তাকিদ এসেছে। হিদায়েতের সাথে কুরআন এবং সুন্নতকে শক্তভাবে ধারণ করা সম্পৃক্ত। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهٗ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ"[২১]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ"[২২]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ، وَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ."[২৩]

হাদিস সংরক্ষণ ও বর্ণনা করার ফযিলতের বর্ণনা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ"[২৪]

---

২১. মেশকাত, হাদিস নং-১৭৬
২২. মেশকাত, হাদিস নং-১৮৬
২৩. মেশকাত, হাদিস নং-২৩৯
২৪. আল হাদিস

সুতরাং 'সাওয়াদে আযম' হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। আহলে হাদিস নয়। নামধারী আহলে হাদিস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ওই সকল লোক, যারা নস (কুরআন ও হাদিস) এবং ইজমার অনুসারী। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. 'ইকদুল জিদ' কিতাবে গায়রে মুকাল্লিদদের পরিচয়ে এটিই বর্ণনা করেছেন। তারা ইজমা কিয়াস এবং আসারে সাহাবাকে অস্বীকার করে। এরপর তারা আবার কীভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে শামিল থাকতে পারে? 'আল-কাওলুল জামিল' কিতাবে শাহ সাহেব রহ. অসিয়ত করেছেন, গায়রে মুকাল্লিদ, যারা নিজেদের 'আহলে হাদিস' বলে দাবি করে, তাদের সাথে ওঠা-বসা করবে না।[২৫]

২৫. পৃষ্ঠা: ১৩৪

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

('রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া ২:৫৯' থেকে সংগৃহীত)

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর কাছে প্রেরণ করা হত। বুখারী শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির কাছে প্রেরণ করা হত। আর আমাকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

তখন যেহেতু নবুওয়াতের ধারা চালু ছিল, তাই এক নবীর পর অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। সেসময় নতুন উম্মত প্রেরণ করা হত না। কিন্তু খাতামুন-নাবিয়্যিনের পর যেহেতু নবুওয়াতের ধারাবহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই পয়গাম পাঠানোর জন্য তার উম্মতকে প্রেরণ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ

বনী ইসরাইলের যাবতীয় বিষয় পরিচালনার এবং শৃঙ্খলার বিষয়টি নবীগণ আনজাম দিতেন। যখন কোনো নবীর ইনতেকাল হয়ে যেত, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। নিঃসন্দেহে আমার পর কোনো (নতুন) নবী নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তার স্থলাভিষিক্ত হবে তার উম্মত। অতীতে সকল আম্বিয়ায়েকেরাম আলাইহিমুস সালাম, মুফাহহিমীনের[২৬] সকল প্রকারের শীর্ষে ছিলেন না, বা সকল প্রকারের

---

২৬. মুফাহিমীন: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আট শ্রেণীর মানুষ। রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ ২:৪৬ এর মাঝে এর বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সমন্বয়ক ছিলেন না। বরং তারা শুধু এক বা দুটি শাস্ত্রের বিদ্যান ছিলেন। সুতরাং এমন সকল বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি তিনিই হতে পারেন, যিনি মুফাহ্হিমীনের সকল প্রকারকে নিজের মধ্যে একত্র করেন। এমন ব্যক্তি শুধু একজনই। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির অধিকারী সত্তা। তিনি খাতামুন-নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই। آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری এর কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। এ কারণে নবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মাকামের অধিকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রমাণপঞ্জি

খাতামুন-নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন দুই পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে তার উম্মতকেও প্ররণ করা হয়েছে। আর এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বৈত আগমনের অর্থ। শাহ সাহেব রহ. এর তিনটি দলিল বর্ণনা করেছেন। দুটি আয়াত এবং একটি হাদিস, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

প্রথম দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত শাশ্বত, সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًاوَّ نَذِيْرًا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

আমি আপনাকে সকল মানুষের জন্য পয়গাম্বর বানিয়ে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বোঝে না।[২৭]

অর্থাৎ আরব হোক কিংবা অনারব। বর্তমান হোক কিবা ভবিষ্যৎ। তাকে সকলের কাছে পাঠানো হয়েছে। একদিকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

২৭. সুরা সাবার ২৮ নং আয়াতে

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা দুনিয়ায় দাওয়াতের জন্য যাওয়া কঠিনসাধ্য ব্যাপার। একারণে তার আগমনকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয়। জাযিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের কাছে তার আগমন মাধ্যমবিহীন। আর পুরো দুনিয়ায় তার আগমন উম্মিয়্যিন তথা সাহাবীগণের মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং সাহাবীদের জামাতও প্রেরিত। আর তাও কোনোনা-কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আগমন। এভাবেই তার দুইপর্বের আগমন সাব্যস্ত হয়।

সুরা জুমার ২ ও ৪ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ، يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ، وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ তিনিই, যিনি উম্মিদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে মহান পয়গাম্বর হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন। তাদের কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্য থেকে আরও কিছু লোক, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, (তাদের কাছেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে) এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এটি (নবুওয়াত) আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল।[২৮]

উক্ত আয়াতে উম্মিয়্যীন শব্দের উদ্দেশ্য হল আরব অধিবাসীগণ, যারা রাসূলের আগমনের সময় জাযিরাতুল আরবে বসবাস করতেন। তাদের অধিকাংশই হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন এবং

২৮. সুরা জুমার, আয়াত ২ ও ৪

মূর্খ ছিলেন। তাদের নিকট নবিয়ে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই পাঠানো হয়েছে। আর এই কারণেই তার উপাধি (اَلنَّبِيُّ الْأُمِّيُّ) উম্মি নবী।[২৯] তাওরাত ও ইনজিলেও তার এসকল গুণের আলোচনা করা হয়েছে।[৩০]

আর اَلْآخَرِيْنَ এর عطف হয়েছে اَلْأُمِّيِّيْنَ এর উপর। আর اَلْآخَرِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সকল অনারব জনগোষ্ঠী। সুতরাং তারাও এই ভিত্তিতেই আরবদের মধ্যে শামিল। কেননা সকল মানুষ এক মা-বাবার সন্তান। এটিই আয়াতের বিশুদ্ধ তাফসির। শাহ সাহেব রহ. আয়াতের অনুবাদ করেছেন, ‘এই পয়গাম্বরকে বনি আদমের অন্যান্য জাতির কাছেও পাঠানো হয়েছে, যাদের সাথে এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মিলন হয়নি।’ টীকায় লিখেছেন, ‘পারস্য এবং সমগ্র অনারব।’ সুতরাং اَلْآخَرِيْنَ দ্বারা শুধু হিন্দু উদ্দেশ্য এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।[৩১]

وَاو এর দ্বারা عطف করার ক্ষেত্রে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف এর মাঝে এক দিক বিবেচনায় ‘ইত্তেহাদ’ তথা দুটি একই বুঝায় আবার ভিন্ন দিক বিবেচনায় নিলে ‘মুগায়িরাত’ তথা বিপরীত বুঝায়। এখানে ইত্তেহাদ এই ভিত্তিতে হয়েছে যে, আরব ও অনারব সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আর মুগায়িরাত এই ভিত্তিতে হবে যে, প্রথম দলের নিকট মাধ্যমবিহীন প্রেরিত এবং اَلْآخَرِيْنَ তথা অন্যদের নিকট মাধ্যমসহ প্রেরিত। অর্থাৎ উম্মি উম্মতের মাধ্যমে প্রেরিত। আর ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ এর মাঝে ইঙ্গিত আছে যে, ঈমানের দৌলত সকল অনারবের ভাগ্যে জুটবে না। এ কারণেই তাদের থেকে জিযিয়া

---

২৯. দেখুন! সুরাতুল আরাফ ১৫৭-১৫৮ নং আয়াত

৩০. উম্মি উপাধীর আরও তিনটি কারণ আছে। যথা-

প্রথম কারণঃ নবীজির দেশ উম্মুল কুরায়।

দ্বিতীয় কারণঃ তিনি উম্মিয়্যীন গোত্রের অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয় কারণঃ তিনি অন্য নবীগণের মতই উম্মত ওয়ালা। বিস্তারিত দেখুন! হিদায়াতুল কুরআন, সুরা আরাফ ১৫৭-১৫৮ নং আয়াত।

৩১. যেমনটি “আব ভি না জাগোগে তুম” এর লিখকের ধারণা।

(কর) গ্রহণ করা হয়। এমনটি অনুগ্রহের কমতির কারণে নয়; বরং وَ اللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার কারণে। আর যেহেতু এ ধরনের কোনো বিষয় উম্মিয়্যীনের ব্যাপারে আসেনি তাই ইমাম আযম রহ. এর নিকট তাদের থেকে 'কর' গ্রহণ করা হয় না।

সুতরাং যখন উম্মিগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেল, জাযিরাতুল আরবের বাসিন্দাগণ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলো তখন সুরা নাসর অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হল, আপনি আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকুন। আপনার দুনিয়ার কাজ পূর্ণতায় পৌছে গেছে। ভবিষ্যতের কাজ সাহাবীগণ সামলে নিবেন।

দ্বিতীয় দলিল

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ، وَ لَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান নিয়ে আসতো তা হলে তা তাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম হত। তাদের মধ্য থেকে কিছু মুমিন আর অধিক সংখ্যক কাফের।[৩২]

উক্ত আয়াতের তাফসিরের ব্যাপারে হযরত উমর রা. থেকে তিনটি ইরশাদ বর্ণিত আছে। যেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. ইবনে জারির তাবারী ও ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী রহ. (মুফাস্সিরে কুরআন তাবেয়ী) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে হযরত উমর ফারুক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

---

৩২. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

لَوْ شَاءَ اللهُ لَقَالَ : أَنْتُمْ فَكُنَّا كُلُّنَا، وَ لٰكِنْ قَالَ: كُنْتُمْ خَاصَّةً فِيْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيْعِهِمْ كَانُوْا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন أَنْتُمْ তা হলে আমরাও এই আয়াতের জ্বলন্ত সাক্ষী হতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা كُنْتُمْ বলেছেন বিশেষভাবে সাহাবীগণের ব্যাপারে আর যারা সাহাবীগণের মতো কাজ করবে তারাও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এই উম্মতকে লোকদের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।

২. আল্লামা সুদ্দি রহ. থেকে ইবনে জারির এবং ইবনে আবি হাতেম রাহিমাহুমুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসিরে হযরত উমর রা. এর বাণী বর্ণনা করেন,

قَالَ يَكُوْنُ لِأَوَّلِنَا، وَ لَا يَكُوْنُ لِاٰخِرِيْنَ

তিনি বলেন, এই আয়াত আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য অর্থাৎ সাহাবীদের জন্য, পরবর্তীদের জন্য নয়।

৩. ইবনে জারির হযরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... الاية، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ سَرَّه أَنْ يَكُوْنَ مِنْ تِلْكُمُ الْأُمَّةِ فَلْيُؤَدِّ شَرْطَ اللهِ مِنْهَا.

আমাদের এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত উমর রা. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যেব্যক্তি এই উম্মতের (খাইরে উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সে যেন আয়াতের মাঝে আরোপিত আল্লাহ তায়ালার ওই সকল শর্ত পূরণ করে।

হযরত উমর রা. এর উল্লিখিত তিনটি বাণীই কানযুল উম্মাল ২:৩৭৫-৩৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। ধারাবাহিকভাবে হাদিস নং ৪২৮৯, ৪২৯২, ৪২৯৩। হায়াতুস সাহাবা (আরবি) ১:১৭ এর প্রথম এবং দ্বিতীয় আসার উল্লেখ আছে।

আরবি ব্যাকরণের একটি নাহবী কায়েদা জেনে নিন। যেন أَنْتُمْ এবং كُنْتُمْ এর মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এবং جملہ اسمیہ خبریہ তথা সংবাদপ্রদানমূলক বাক্য, যা শুধু কোনোকিছু সাব্যস্ত হওয়া এবং স্থায়িত্বের অর্থ দেয়। তাতে যমানার কোনো আলোচনা হয় না। যেমন زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে। বাক্যটি যায়েদের দাঁড়ানো সাব্যস্ত হওয়া এবং এর স্থায়িত্বের বিষয়টি বুঝাচ্ছে। নির্দিষ্ট কোনো যমানার বাধ্যবাধকতা তাতে নেই। আর كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এর মাঝে كَانَ এর اسم হল ضمیر। আর خَيْرَ أُمَّةٍ শব্দটি مرکب اضافی হয়ে خبر।

আর নাহবী কায়দা হল, کان শব্দটি বাক্যে বর্ণিত শব্দ অথবা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যমানায় তার উভয় মামুল তথা اسم ও خبر এর বিষয়বস্তুর সাথে শুধু মিলিত হয় (অর্থাৎ কোনো বর্ধিত বিষয় হয়ে তাতে যুক্ত হয় না)। যদি শব্দটি فعل ماضی হয় তা হলে যমানা ماضی বা অতীত কাল হবে। তবে শর্ত হল তাকে ماضی ছাড়া অন্যকোনো কিছুর জন্য নির্দিষ্টকারী কোনো শব্দ থাকতে পারবে না। আর যদি শব্দটি নিরেট فعل مضارع এর জন্য হয়, তবে তার মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকবে। তবে শর্ত হল, যমানার সাথে নির্দিষ্টকারী কোনো حرف যেমন, لم ,لن ইত্যাদি বাক্যটিকে নির্দিষ্ট কোনো যমানার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে না। অথবা বাক্যটিকে যেন ماضی বানিয়ে না দেয়। আর যদি শব্দটি فعل امر তথা আদেশসূচক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে তার মধ্যে ভবিষ্যৎ কাল থাকবে। যেমন, كَانَ الطِّفْلُ جَارِيًا (শিশুটি চলতে লাগলো)। এই উক্তিটি তখনই করা হয় যখন শিশুটি অতীতকালে চলতে আরম্ভ করে। আর يَكُوْنُ الطِّفْلُ جَارِيًا (শিশুটি

চলছে অথবা চলবে)। উক্তিটি ওই সময় করা হবে যখন শিশুটির চলা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালে সম্পাদিত হয়। আর كُنْ جَارِيًا (তুমি চলবে)। এমন উক্তি দ্বারা আদেশ করা হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তি যেন ভবিষ্যৎ কালে চলে।[৩৩]

সুতরাং আয়াতে যদি أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ বলা হত তা হলে উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার মাঝে স্থায়িত্বের অর্থ পাওয়া যেত। আর এতে পুরো উম্মত আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হত। কিন্তু আয়াতে আছে كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ। তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে উম্মত বিদ্যমান ছিল তাদের উত্তম হওয়ার গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। সুতরাং সাহাবায়েকেরামই আয়াতের প্রথম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কেননা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় তারাই বিদ্যমান ছিলেন। পরবর্তী উম্মত তখন ছিলেন না। অতএব বাকি উম্মতের যারা আয়াতের শর্ত পূর্ণ করবে তারাও কার্যত আয়াতের উদ্দেশ্য হবে।

এখন হযরত উমর রা. এর তিনটি বাণীর আলোকে আয়াতে কারিমার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়েকেরামকে অর্থাৎ ওই উম্মিদের যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমবিহীন উম্মত, তাদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম উম্মত। এজন্য তোমাদের লোকদের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তোমাদের পুরো দুনিয়াতে পৌছে যেতে হবে। তোমাদের উচিত তোমরা লোকদের ন্যায় কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাধাপ্রদান করবে। আর লোকদের আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিবে। এই সর্বোত্তম উম্মতের মাঝে আহলে কিতাব (ইহুদী) অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও তারা মদিনার অধিবাসী ছিল। কেননা তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি। আহলে কিতাব শব্দটি যদিও ব্যাপক কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর দ্বারা নির্দিষ্ট ইহুদীই উদ্দেশ্য। আর নবীর জন্য ইসমত, মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া জরুরি। কেননা এটা ব্যতীত

৩৩. আন-নাহবুল ওয়াফি ১:৫৪৮

নবী কর্তৃক পৌঁছানো দীনের উপর ভরসা করা যায় না। ঠিক তেমনিভাবে সাহাবীদের জন্য হিফাযত জরুরি। কেননা তারা সর্বোত্তম উম্মত। তারাও একদিক থেকে পরবর্তীদের কাছে প্রেরিত। সুতরাং আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) এবং হিফাযত (আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষণ) ব্যতীত তাদের পৌঁছানো দীনের উপর ভরসা করা যেতে পারে না। আর এই বিধান মানুষের প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকারাজির মতো। তাদের মধ্য থেকে তোমরা যারই অনুসরণ করবে, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে।' (এই হাদিসটি ছয়জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে এবং হাসান লি গাইরিহী পর্যায়ের হাদিস। এর সনদ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে)।

এই আদালত এবং হিফাযতের নামই হল সাহাবায়েকেরাম 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হওয়ার মূল উৎস। যারা বলে, আল্লাহ এবং রাসূলের পর কোনো ব্যক্তির মানসিক দাসত্ব করা জায়েয নেই, তারা শক্ত গোমরাহীতে আছে। তারা যেন ভালোভাবে চিন্তা করে দেখে, তাদের কাছে দীন তো এই সাহাবীদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। যদি তারাই ভরসা ও তাকলিদের উপযুক্ত না হয় তা হলে আপনার দীনের বিশুদ্ধতার যিম্মাদার কে হবে?

মোটকথা সাহাবীগণ উম্মতের এমন একটি স্তর, যারা পুরোপুরি এবং পরিপূর্ণভাবে দীনের ব্যাপারে নিরাপদ ও মাহফুয। তাদের প্রত্যেকেই আকিদাগত ভ্রষ্টতা, আমলী বিভ্রান্তি থেকে পূত-পবিত্র। কেননা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

তৃতীয় দলিল

বুখারী শরিফের রিওয়ায়েতে এসেছে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে নববীতে পেশাব করতে আরম্ভ করল। লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

কেননা সহজীকরণের জন্য তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে, কঠোরতা আরোপকারীরূপে তোমাদের পাঠানো হয়নি।[৩৪]

উক্ত হাদিস শরিফটি সাহাবায়েকেরামের প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে একবারে পরিষ্কার। আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন,

عُلِمَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ أُمَّتَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيْضًا مَبْعُوْثَةٌ إِلَى النَّاسِ، فَثَبَتَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعْثَتَانِ اَلْبَتَّةَ...

এই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতও মানুষের কাছে প্রেরিত। সুতরাং অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইপর্বে প্রেরণের বিষয়টি সাব্যস্ত হল।

ফায়েদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী-আগমনের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী (অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী)। এজন্য তার পর নতুন কোনো নবী আসতে পারে না। বাকি রইল উম্মতের বি'সাত বা প্রেরণের বিষয়টি। তা শুধু পয়গাম পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর নবুওয়তের পূর্ণতার বিষয়টি এখনও বাকি আছে, শেষ হয়ে যায়নি। শুধু নবুওয়াত শেষ হয়েছে। সুতরাং উম্মতের কোনো ফরদ বা ব্যক্তিকে নবী বলা যাবে না।

হাদিস

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

হাদিসটির সনদ

[কিছুদিন একজন আলেম 'আসহাবী কান-নুজুম' হাদিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হাদিসটি উদ্ধৃতি দেওয়ার যোগ্য কি না? জিজ্ঞাসার

৩৪. বুখারী, কিতাবুল অযু, হাদিস নং- ২২০। মেশকাত باب تطهير النجاسات হাদিস নং- ৪৯১

উত্তর লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো কাগজে সংরক্ষিত ছিল। আলোচ্যবিষয়ের সাথে মিল থাকার কারণে তা এখানে যুক্ত করা হল]

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ

হাদিসটি ছয়জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে উমর রা., হযরত জাবের রা., হযরত উমর রা., হযরত আনাস রা., হযরত আবু হোরায়রা রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদিসটি বর্ণিত আছে। তবে যাহ্হাক বিন মুযাহিম হেলালের সূত্রে একটি মুরসাল রিওয়ায়েত আছে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদিস

عَنْ حَمْزَة النَّصِبِيّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَصْحَابِيْ مِثْلَ النُّجُوْمِ فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِه اِهْتَدَيْتُمْ". رَوَاه أَبُوْ شِهَاب الْحَنَّاطِ كَمَا فِيْ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَ فَضْلِه .ابن عبد البر، (٢:١١١) وَ رَوَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِيْ مِيْزَانِ الْاِعْتِدَالِ ١: ٦٠٧ فى ترجمة حمزة)

উক্ত রিওয়ায়েতে হামযা ইবনে আবি হামযা আল জাযারী আন নাসাবী দুর্বল রাবি। তার ব্যাপারে ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন রহ. বলেন, لَا يُسَاوِيْ فُلُسًا (সে এক পয়াসার সমানও নয়)। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, মুনকারুল হাদিস। দারাকুতনী রহ. বলেন, মাতরুক। ইবনে আদি বলেন, عَامَّةُ مَا يَرْوِيْهِ مَوْضُوْعَةٌ (তার অধিকাংশ রিওয়ায়েত মাওযু)। তার একটি রিওয়ায়েত তিরমিযী শরিফেও উল্লেখ আছে। দেখুন, أَبْوَابُ الْاِسْتِيْذَانِ وَ الْاٰدَابِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ ইমাম তিরমিযী রহ. তার হাদিসের ব্যাপারে বলেন, هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَ حَمْزَةُ ضَعِيْفٌ فِيْ الْحَدِيْثِ। মোটকথা এই রাবী হল ضَعِيْف جدًّا (تُحْفَةُ الْاَحْوَذِىْ ٣: ٣٩١) তথা অত্যন্ত দুর্বল।

হযরত জাবের রা. এর হাদিস

جَمِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَه: مَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِه, وَ لَا يَسَعه تَرْكُه إِلٰى غَيْرِه (الحديث) وَفِيْهِ : أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (أَخْرَجَه الدَّارَ قُطْنِيْ فِيْ غَرَائِبِ مَالِكْ وَ الْخَطِيْبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ، كَمَا فِيْ لِسَانِ الْمِيْزَانِ ٢: ١٣٧ و التلخيص الحبير صـ ٤٠٤)

এই সনদের ব্যাপারে দারাকুতনী রহ. বলেন, لَا يَثْبُتُ عَنْ مَالِكٍ وَرِوَاتُه مَجْهُوْلُوْنَ (لِسَان)। আর হাফেয সাহেব ও তালখিসের মধ্যে জামিল-এর ব্যাপারে لَا يُعْرَفُ লিখেছেন এবং লিসানের মধ্যে আবু হাতেম রা. থেকে لَا أَعْرِفُ শব্দ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. জামিউল বয়ানিল ইলম (২:১১১) এর মধ্যে আরও একটি সনদ বর্ণনা করেছেন,

وَ هُوَ هٰذَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُبْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ،ثنا الْقَاضِيْ اَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ،ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوْحٍ، ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، ثنا الحَارِثُ بْنُ غُضَيْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ .

আল্লামা ইবনে আবদুল বার এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন,

هٰذَا اِسْنَادٌ لَا تَقُوْمُ بِه حُجَّةٌ، لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُضَيْنٍ مَجْهُوْلٌ.

হাফেয সাহেব লিসানুল মিযানে আল্লামা ইবনে আবদুল বারের কথা বর্ণনা করে আরও দুটি কথা লিখেছেন, (এক) তুসী এই বর্ণনাকারীর আলোচনা রিজালুস্ শিয়ায় করেছেন। (দুই) ইবনে হিব্বান কিতাবুস সিকাতে তার আলোচনা করেছেন।

সারকথা হল, এই বর্ণনাটিতে রাবীর ব্যাপারে মারাত্মক কোনো সমালোচনা (জরাহ্) নেই। শুধু রাবী অজ্ঞ (মাজহুল) এর সমালোচনা। তা ছাড়া হাদিসটির দুটি ভিন্ন সনদও রয়েছে, যা একটি আরেকটির জন্য শক্তি বৃদ্ধির কারণ। এইজন্য এই সনদে হাদিসটি যয়ীফ কিন্তু খুব বেশি যয়ীফ নয়।

উমর রা. এর হাদিস

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : سَأَلْتُ رَبِّىْ فِيْمَا يَخْتَلِفُ فِيْهِ أَصْحَابِىْ مِنْ بَعْدِىْ ؟ فَأَوْحٰى إِلَيَّ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اَصْحَابَكَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ، بَعْضُهَا أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِشْئٍ مِمَّاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِىْ عَلٰى هُدًى (رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ١: ٢٨٣)

এই রিওয়ায়েতে রাযিন রহ. এতটুকু বাড়তি বিষয় বর্ণনা করেছেন,

قَالَ (أَىْ عُمَرُ) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ (أخرجه رزين كما فى جامع الأصول ٩: ٤١٠كتاب الفضائل، الباب الرابع، الفضل الأول، النوع الثالث)

আর এই রিওয়ায়েতটিই মেশকাতপ্রণেতা গ্রহণ করেছেন। আবুবকর আল বায্যার এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

যাহাবী রহ.-ও মিযানুল ইতেদালের ২:১০৬ এর মধ্যে যায়েদ ইবনুল হাওয়ারী আল আমীর জীবনীতে এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটিও দুর্বল। আবদুর রহীমের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের রায় নিম্নরূপ।

---

৩৫. وكما فى التلخيص الحبير، ٤٥٤ (كما فى جامع بيان العلم ٢: ١١٠)

ইমাম বুখারী বলেন, تَرَكُوْهُ। ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন বলেন, كَذَّابٌ। আবার কখনো বলেছেন, لَيْسَ بِشَيْئٍ। জুরজানী বলেন, غَيْرُ ثِقَةٍ। আবু হাতেম বলেন, تُرِكَ حَدِيْثُهُ। আবু যুরআ বলেন, وَاهٍ। আবু দাউদ বলেন, ضَعِيْفٌ।[৩৬] আর এই হাদিসের ভিত্তি এই আবদুর রহীমের উপর নির্ভরশীল। (كما فى الكامل لابن عدى(٣: ٣٠٠)

আবু হোরায়রা রা. এর হাদিস

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِي الْقَاضِيْ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ مَنِ اقْتَدٰى بِشَيْءٍ مِنْهَا اِهْتَدٰى (ميزان الاعتدال صـ: (١: ٤١٣)

এই রিওয়ায়েতটি অত্যন্ত দুর্বল। জাফর বিন আবদুল ওয়াহিদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের রায় নিম্নরূপ।

দারাকুতনী বলেন, يَضَعُ الْحَدِيْثَ। আবু যুরআ রহ. বলেন, رَوٰى أَحَادِيْثَ لَا أَصْلَ لَهَا ইবনে আদি বলেন, يَسْرُقُ الْحَدِيْثَ وَ يَأْتِيْ بِالْمَنَاكِيْرِ (ميزان)

হযরত আনাস রা. এর হাদিস

হযরত আনাস রা. এর হাদিসটি বায্যার রহ. বর্ণনা করেছেন। হাফেয সাহেব রহ. তালখিসের ৪০৪ নং পৃষ্ঠায় এটি উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন, 'এর সনদটি বেকার'।

نَصُّهُ : وَ ذَكَرَهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّى وَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ أَيْضًا، وَ اِسْنَادُهُ وَاهٍ اِنْتَهٰى.

(আমি এই হাদিসের সনদটি পাইনি)

৩৬. মিযান।

ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি ইমাম বায়হাকী রহ. তার 'আলমাদখাল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। মুনাবী রহ. ফায়যুল কাদীর শরহে জামে সগীর (১:২০৯) কিতাবে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এর সনদও উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্যও করেননি।

وَ نصه : وَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : لَا يُسِرُّنِيْ أَنَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً، وَ يَدُلُّ لِذٰلِكَ مَا رَوَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: أَصْحَابِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ فَبِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ اِنْتَهٰى.

মুরসাল হাদিস

مِنْدَلٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَزَاحِمَ مُنْقَطِعًا.

হাফেয রহ. তালখিসে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, আবু যর হারাবী কিতাবুস্ সুন্নাহয় এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি দুর্বল। وَ هُوَ فِيْ غَايَةِ الضُّعْفِ।

যেহেতু উক্ত হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রত্যেক সনদই দুর্বল কিংবা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু সবগুলো মিলে শুধু যয়ীফই থেকে যাবে। আত-তালীকুস্ সাবী শরহে মেশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের ৮:২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

وَفِيْ أَسَانِيْدِهَا مَقَالٌ، لٰكِن يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا كَذَا فِيْ ظَفْرِ الْأَمَانِيْ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الْجُرْجَانِيْ (صــ: ١٨٠)

এর দৃষ্টান্ত হল أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ এই হাদিসটিও ছয়জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। আর প্রত্যেকটি রিওয়ায়েত অত্যন্ত যয়ীফ। নসবুর্

রায়াহ কিতাবের প্রথম খণ্ডে এই বর্ণনাটির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সব মিলে শুধু যয়ীফই থেকে গেছে। আর আহনাফের নিকট যয়ীফ হাদিস মুজতাহিদের রায়ের উপর মুকাদ্দাম। সুতরাং আহনাফ এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এমনিভাবে এই হাদিসটি একাধিক সনদের কারণে শুধু যয়ীফ হবে, যা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

আর ইবনে হাযম যাহেরীর উক্তি,

هٰذَا خَبَرٌ مَكْذُوْبٌ مَوْضُوْعٌ بَاطِلٌ

গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বায্যার এর উক্তি لَمْ يَصِحُّ ঠিক আছে। কেননা তার কোনো বিশুদ্ধ সনদ নেই। আর শুদ্ধতা অস্বীকার করার দ্বারা যয়ীফের নফী হয় না। বায্যার রহ. এই হাদিসের উপর যুক্তিগত ধাঁচেও অভিযোগ পেশ করেছেন। বলেছেন,

وَهُوَ هٰذَا : وَ الْكَلَامُ أَيْضًا مُنْكَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ قَدْ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، فَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَ هٰذَا الْكَلَامُ يعَارِضُ حَدِيْثَ عَبْدِ الرَّحِيْمِ لَوْ ثَبَتَ، فَكَيْفَ وَ لَمْ يَثْبُتْ، وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَبِيْحُ الْاِخْتِلَافَ بَعْدَهٗ مِنْ أَصْحَابِه وَ اللهُ اَعْلَمُ. هٰذَا اٰخِرُ كَلَامِ الْبَزَّارِ (جامع بيان العلم ٢: ١١٠)

আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. উপযুক্ত একটি উত্তর প্রদান করেছেন, সেটি হল এই,

وَلَيْسَ كَلَامُ ا لْبَزَّارِ بِصَحِيْحٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ الْاِقْتِدَاءَ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنفرِدِيْنِ: إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ جَهِلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَ مَنْ كَانَتْ هٰذِهِ حَالَهٗ فَالتَّقْلِيْدُ لَازِمٌ لَهٗ، وَ لَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهٗ

أَنْ يَقْتَدِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا تَأَوَّلُوْا تَأْوِيْلًا سَائِغًا جَائِزًا مُمْكِنًا فِي الْأُصُوْلِ، وَ إِنَّمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ نَجْمٌ جَائِزٌ أَنْ يَّقْتَدِيَ بِهِ الْعَامِّيُّ وَ الْجَاهِلُ بِمَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ دِيْنِه، وَ كَذٰلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مَعَ الْعَامَّةِ،وَ اللهُ أَعْلَمُ (جامع بيان العلم ٢: ١١١)

ফায়েদা

এগুলো ব্যতীত একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখলে ভালো হয়। বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে যখন আহনাফের কাছে রিওয়ায়েত থাকে আর অন্য হযরতগণের কাছে রিওয়ায়েত না থাকে তখন সকল মুহাদ্দিসের কথা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র হয়ে যায়। এই রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, অট্টহাসির দ্বারা নামায এবং অযু উভয়টি বাতিল হওয়ার রিওয়ায়েত বিশুদ্ধ। 'এলাউস সুনান' নিরীক্ষণ করে দেখুন। কয়েকটি সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন চিন্তার মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রিওয়ায়েতটি যাচাইকৃত নয়। হায়েজের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময়ের ব্যাপারে যে রিওয়ায়েতটি আছে, তারও একই অবস্থা। ঠিক তেমনিভাবে,.مَنْ كَانَ لَهٗ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ এই রিওয়ায়েতটির অবস্থা। আলোচনাধীন হাদিসটিও বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে আহনাফের দলিল। আর অন্য হযরতদের নিকট এর সমর্থনকারী কোনো দলিল নেই। আর সেই মাসআলাটি হল সাহাবীদের কাওল হুজ্জত হওয়ার মাসআলা। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমত এভাবে লিখেছেন,

تَرَكَ التَّمَسُّكَ بِأَقْوَالِهِمْ مَالَمْ يَتَّفِقُوْا وَ قَالَ : هُمْ رِجَالٌ وَ نَحْنُ رِجَالٌ (حجة الله ١: ١٤٧)

অন্য ইমামগণের মাসলাক এমনই। অর্থাৎ সাহাবীদের ইজমায়ী ফয়সালা তো শরীয়তের দলিল। কিন্তু ইনফেরাদী ফতোয়া শরীয়তের দলিল নয়। মুজতাহিদ চাইলে তার ইত্তেবা (তাকলিদ) করবে অথবা নতুনভাবে

ইজতিহাদ করবে। কিন্তু আহনাফের নিকট সাহাবীদের ইনফেরাদী ফতোয়াও শরীয়তের দলিল। তাদের বর্তমানে মুজতাহিদ ইজতিহাদ করবে না বরং সাহাবীর কওলের ইত্তেবা করবে। আর সাহাবীদের মতবিরোধ হলে একটিকে প্রাধান্য দিবে। এ ব্যাপারে হানাফীদের দলিল এই হাদিস। কিন্তু অন্য হযরতগণের কাছে এ ব্যাপারে কোনো রিওয়ায়েত বিদ্যমান নেই। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসের যয়ীফের উপর একমত হয়ে গেছেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর উপর সবচেয়ে আশ্চর্যবোধ হয়। তিনি التلخيص الحبير গ্রন্থে সকল সনদ একত্র করেছেন (ইবনে আব্বাসের সনদ ব্যতীত)। অতঃপর ইবনে হাযমের কওল এনেছেন। যদিও হাফেয সাহেব এমন স্থানে লিখে থাকেন,

رُوِيَتْ بِطُرُقٍ يَقْوِىْ بَعْضُهَا بَعْضًا ...اه فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكِى!

আর মূলনীতি হল, যদি কোনো রিওয়ায়েত একাধিক সনদের মাধ্যমে একজন সাহাবা থেকে বর্ণিত হয় আর সকল সনদ যয়ীফ হয় তখন সনদের সংখ্যাধিক্য এই কথার দলিল হয় যে, لَهٗ أَصْلٌ। আর যদি হাদিসটি একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় এবং সকল সনদের মাঝে সাধারণ দুর্বলতা থাকে, তখন সকল সনদ মিলে রিওয়ায়েতটি হাসান লি গায়রিহী হয়ে যায়। যেমন, اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ তেরজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। আর প্রত্যেক সনদের ব্যাপারেই সমালোচনা আছে। সুতরাং সব মিলে রিওয়ায়েতটি হাসান লি গায়রিহী হয়ে গেছে। আর যদি সকল সনদ অত্যন্ত দুর্বল হয় তা হলে সব মিলে শুধু যয়ীফ থেকে যায়।[৩৭]

---

৩৭. فى تدريب الراوى (صـ ১০৪) و أما الضعيف لفسق الراوى, أو كذبه، فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الاخر مثله، لقوة الضعف، و تقاعد هذا الخابر، نعم يرتقى بمجموع طرقه عن كونه منكرا، أولا أصل له: صرّح به شيخ الإسلام ـ أى الحافظ ابن حجر قال : بل ربما كثرت الطرق حتى أو صلته إلى درجة المستوي و سيئ الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق اخر، فيه ضعف قريب محتمل : ارتقى بمجموع ذلك إلى درجات الحسب اه (قواعد فى علوم الحديث صـ ৮১)

যেমন, হায়েজের সর্বনিম্ন সময় সংক্রান্ত রিওয়ায়েত। সুতরাং এই নীতিমালার আলোকে উক্ত হাদিসটি শুধু যয়ীফ হবে। বরং মোল্লা আলী কারী রহ. এর মতে হাসান লি গায়রিহী। তিনি 'আলমাওজুআতুল কুবরা' কিতাবের শেষ দিকে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছেন। সেখানে লিখেছেন,

وَ هُوَ هٰذَا: وَكَذَا تَقْدِيْرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَ أَكْثَرُهُ بِعَشَرَةٍ: بَاطِلٌ قُلْتُ: وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي وَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَ الْعُقَيْلِي وَ ابْنُ الْجَوْزِيْ، وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَ لَوْ ضَعُفَتْ يَرْقِي الْحَدِيْثَ إِلَى الْحَسَن فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لَا يَسْتَحْسن (صـ ١٧١)

আবদুল আলী বাহরুল উলুম রহ. ফাওয়াতিহুল রাহমুত (২:১৫৭ মিসরী) কিতাবে পরিষ্কারভাবে উক্ত হাদিসকে হাসান লি গায়রিহী বলেছেন,

وَنَصُّهُ: أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ رَوَاهُ رَزِيْن، وَ قَدْ تَكَلَّمُوْا عَلَيْهِ لَكِنْ لَا ضَيْرَ، فَإِنَّ لَهُ طُرُقًا كَثِيْرَةً وَ بِمِثْلِهَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الْحَسَنِ.

লিখেছেন

সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

আফাল্লাহু আনহু

১০ মহররম ১৪১৭

আপনি কেন মাযহাব মানবেন
মুফতী সাঈদ আহ...
116999#836601-1
R

ISBN : 778-984-91123-50-4

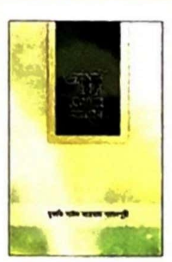

মাকতাবাতুল হেরা

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার(আন্ডারগ্রাউন্ড), দোকান নং-৩, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২২

যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা বিক্রয়কেন্দ্র
৮২/১২ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২৩

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী বিক্রয়কেন্দ্র
কিতাব মার্কেট, দোকান নং-২৩,২৪ মাদরাসা রোড, ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯০-০৭১৮৯৮

cover ■ kazi jubair mahmud . 01830338105